সন্দেশ

নবম বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৭৬/ডিসেম্বর ১৯৬৯

# কি এমন শক্ত ?

প্রভাকর মাঝি

'বাবলু, অনেকে বলে, তুমি বড়ো বিচ্ছু,
করতে চাও না লেখাপড়া নাকি কিচ্ছু ?
তবে টেকো জ্যোতিষীর কথাই কি ফলবে ?
কি অত লিখছো মন দিয়ে, তুমি বলবে ?
হিলহিলে, মোটা নানা পুঁথি ডাঁই করলে,
নাকি কোনো সিরিয়াস গবেষণা ধরলে ?'
'কে, কাকু ! নতুন স্যর সঞ্জীব সেন যে,
মাথার ভাবনা কাল উস্কে দিলেন যে।
বললেন—কাজ করো, কাজ, মনে রাখবে,
যাতে করে ইতিহাসে নাম লেখা থাকবে।
পড়া নয়—ইতিহাস হতে হবে সবকে—
থামিয়ে দিলেন ক্লাসটার কলরবকে।
সে থেকে মগজ করি ত্যক্তবিরক্ত,
এখন বুঝছি সোজা—কি এমন শক্ত ?
অঙ্ক ভূগোল রেখে গদ্য ও পদ্য,
ইতিহাস নিয়ে কাকু, পড়েছি যে সদ্য।
বড়ো আলমারি থেকে ইংরাজী বাংলা
ইতিহাস বই নিয়ে দিচ্ছি যে হামলা।
ছোড়দির বড়দির যেখানে যা পাচ্ছি,—
বড়ে বড়ো করে দ্যাখো, নাম লিখে যাচ্ছি।'

ধারাবাহিক উপন্যাস

রেবন্ত কুমার গোস্বামী

( পাকিস্তান থেকে এসে অরুমিতুরা সোনাপোতায় ছিল। বাবা কলকাতায় মেসে থাকতেন, হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা যান। ওরা সোনাপোতা ছেড়ে সিঁথির ছোট্ট বাড়িতে এল। মিতু স্কুলে ভর্তি হল। মাও সেখানে সেলাই শেখাবেন। ক্রমে গ্রামের ছেলে অরু ক্লাসের সব চেয়ে মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত হল। বিজ্ঞানের ক্লাস অরুর সব চেয়ে ভাল লাগে। সে স্বপ্ন দেখে যে বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক হবে। সে ব্যায়াম করে, নিজের শরীর ভাল করবার চেষ্টা করে। তিনটে লেটার নিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা পাশ করল অরু। ফিজিক্স অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হল। কিন্তু, মার পক্ষে আর বেশিদিন কাজ করা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে সে পড়া ছেড়ে দিয়ে একটা চাকরি নিল। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে, কিন্তু আপাততঃ বোম্বাই চলে যেতে হবে। )

একুশ

সেদিনটা এসে গেল। আগের দিন মা অরুর জন্যে কত কি রান্না করলেন।

অরু খেতে বসে হাসতে হাসতে বলছিল, 'ফাঁসির খাওয়া খাওয়াচ্ছ নাকি মা? যদি আর না ফিরি?'

মা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেন, 'বালাট ষাট! ওকথা বলে!'

মার দিকে তাকিয়ে অরু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। ছি ছি, এসময় তার মুখ দিয়ে ওরকম কথা বেরোনো মোটেই উচিত হয়নি। মা এমনিতেই ভেঙে পড়েছেন।

সন্ধ্যেবেলা ট্রেন। হাওড়া ষ্টেসনে মিতু গিয়েছিল মাকে সংগে নিয়ে। গিয়েছিল অন্তদা আর দীপুদা। তাছাড়া আরেকজন। সে রজত। অন্তদার চেষ্টায় সে এখন একটা কাজে ঢুকেছে। প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়ারও চেষ্টা করছে। অন্তদা বলে, ওরকম বিনয়ী ছেলে দেখাই যায় না।

মামা আসতে পারেন নি। তিনি রোগী দেখতেই ব্যস্ত থাকেন। তবুও সকালে বাড়ি এসে বলে গিয়েছিলেন, 'খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে সাবধান থাকবি অরু। এ সময় ওখানে খুব অসুখ করছে।' মামা একটা অসুখের নাম করেছিলেন। রোগটা যে পেটের সেটা মিতু বুঝতে পেরেছিল মার কথায়। মামার কথা শুনে মা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, 'ও যে আমার রান্না ছাড়া কখনো কিছু খায়নি দাদা। ওর স্বাস্থ্য কি টিকবে ওখানে?'

মামা কিছু বলার আগেই অন্তদা বলেছিল, 'মাসীমা, আমার কাছে অরু যা আসন শিখেছে তাতেও যদি পেটের রোগ হয়, তবে আমি আসব আর আপনি নিজের হাতে আমার কান মলে দেবেন।'

গাড়ি ছাড়বে কিছুক্ষণ পরে। অরু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মা কাঁদছেন। মিতু ভাবে, মার জীবনটাতে শুধু কান্না।

এসময় দীপুদা কথাবার্তায় আবহাওয়াকে কিছুটা হাল্কা করে রেখেছে। দীপুদা বলে, 'বোম্বেটা ঘুরে আসিস অরু। আমার কয়েকজন বন্ধু আছে ওখানে সিনেমা লাইনে। আমিও যাব। গিয়ে থাকব নটরাজ হোটেলে। বোম্বের সব চাইতে কস্টলি হোটেল।'

অন্তদা বলে, 'অরু, নিজের মেরুদণ্ডটা চিরকাল সোজা রাখবি। এই আমার দেশ, যেখানে বড়লোকের অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে বছরের পর বছর ফেল করে উচ্চশিক্ষা শিখছে বিদেশে। আর সত্যিকারের মেধাবী ছেলেকে পড়াশোনা ছেড়েছুড়ে দিয়ে চাকুরী নিতে হচ্ছে। কি বিচিত্র এই দেশ!' দূরের দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অন্তদা।

মিতু মার কাছে শুনেছিল অন্তদার বাবা পুলিশের গুলিতে মারা যান বিয়াল্লিশের আন্দোলনে।

অরু মাকে প্রণাম করল, অন্তদাকেও প্রণাম করল। দীপুদাকে প্রণাম করতে যেতেই দীপুদা বাধা দিয়ে বলল, 'উঁহু, অর্ হেভোয়া।'

অরু বলে, 'সেটা আবার কি বস্তু দীপুদা?'

—'আবার দেখা হবে—ফরাসী ভাষায়।' দীপুদা বলে।

অরু হেসে রজতের দিকে তাকিয়ে বলে, 'অর্' হেভোয়া রজতদা।' এই আবহাওয়াতেও সকলে হেসে উঠল।

মিতু ছোটদাকে প্রণাম করল। ভাবল, আজ আর ছোটদা গাড়িতে উঠে বকবক করবে না ছোটবোনের সংগে। দুদিন ধরে চুপ করে থাকবে।

অরু বলে, 'মিতু সাবধানে থাকবি মন দিয়ে পড়াশোনা করিস। দু'বছর পরে যদি বাংলাদেশে আসতে পারি তখন তো তুই কলেজে যাচ্ছিস। আমি তো কলেজের মুখই ভালোভাবে দেখলাম না বললে চলে। তখন যেন আবার মূর্খ ছোটদাকে ঘেন্না করিস না।'

মিতু ছোটদার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বলে, 'ছোটদা, যেদিন মিতু তোকে মূর্খ বলে ঘেন্না করবে, সেদিন তার গলা টিপে মেরে ফেলিস।'

অরু বলে, 'এই ছাখো, ধাড়ি মেয়ে কাঁদে। ঐ ছাখ, সকলে তাকাচ্ছে।'

এক সময় অরুকে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। মিতু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত শুনল গাড়ির শব্দ—হুস্ হুস্ হুল্ হুস্।

হঠাৎ মনে হলো, এ গাড়ির শব্দ নয়—তার মার নিঃশ্বাসের শব্দ।

তারা নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল।

## বাইশ

একদিন দুদিন করে কয়েকমাস কেটে যায়। মা স্কুলে যান, মিতুও যায়। তারপর বাড়ি এসে বাড়ির কাজ করে। সকাল সন্ধ্যে পড়তে বসে। সবই আগের মতো চলে। তবুও সব যেন কেমন খাপছাড়া লাগে।

প্রথম প্রথম মিতু পড়ার থেকে ওঠার সময় পেছনটা দেখে নিয়ে সাবধানে উঠত। বেণীটা চেয়ারের সংগে

বাঁধা নেই তো? সংগে সগে মনে পড়ে যায় ছোটদা তো নেই। এখন থেকে সে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। মিতুর খাতাতে কেউ আর তার ছবি এঁকে রাখবে না।

যখন একটা শক্ত অংক কিছুতেই মাথায় ঢোকে না, তখন যে তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে ছোটদার পড়ার জায়গার কাছে গিয়েই আবার ফিরে আসত। মনে পড়ে যেত ছোটদা নেই। ছোটদা কত সহজে অংক বুঝিয়ে দিত।

একদিন ছোটদা তাকে বীজগণিত শেখাতে বলল, 'বল্ তো মিতু, একটা চিড়িয়াখানায় পশুপাখি মিলিয়ে ৩০টা মাথা আর ১১২টা পা আছে। কটা পশু আর কটা পাখি চিড়িয়াখায় আছে?'

মিতু ধাঁধার ওস্তাদ। কিন্তু এটা তার কাছেও বেশ কঠিন লাগল।

অরু, বলল, দূর বোকা, ছাখ্ অংক করে কত তাড়াতাড়ি এটা করে দিচ্ছি।' ছোটদা খুব সহজে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

মারও প্রথম প্রথম এরকম ভুল হতো। সন্ধ্যেবেলা মিতুকে খেতে ডাকতে গিয়ে রান্নাঘর থেকে ডাকেন, 'অরুমিতু খেতে আয়।'

সংগে সংগে মনে পড়ে যায় যে অরু নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ভাবেন অরুটা এখন যে কি খাচ্ছে দাচ্ছে কে জানে! ওর যেরকম ভোলা মন হয়ত না ডাকলে খেতেই ভুলে যাবে। ওরা কি অত ডেকে ডেকে খাওয়াবে? খবরের কাগজে পড়তেন বোম্বাই এ পেটের রোগে কত লোক মারা গিয়েছে মাত্র করেক মাসে। পড়ে কদিন ঘুম ছিল না। অরুর চিঠি পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন! অরু লিখেছিল, 'তুমি অনর্থক চিন্তা করো না মা। আমার খাওয়া দাওয়া ভালোই হচ্ছে। গ্যাস্ট্রিক রোগটা বোম্বাই সহরে হয়েছে। এটা সেখান থেকে একশো মাইল দূরে।

আমের সময় আম কাটতে কাটতে মার হাত থেমে যায়। ভাবেন, অরু কি ওখানে আম খাচ্ছে? মিতুকে জিজ্ঞেস্ করেন, 'হ্যাঁরে ওখানে তো বোম্বাই আম অনেক পাওয়া যায়—না?'

মিতু হেসে বলে, 'হ্যাঁ বোম্বাই আম শুধু কেন, বোম্বাই নারকেল পাওয়া যায়।'

মা অবাক হন, 'বোম্বাই নারকেল?'

মিতু পেছন গেকে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'জানো না? যে নারকেল গাছ থেকে মাটিতে না পড়ে সোজা ওপর দিকে উঠে যায়।'

মা বলেন, 'তোর সবটাতে ঠাট্টা! হাত্ ছাড়্, হাত কেটে যাবে।'

মা আশা করেছিলেন পূজোর সময় হয়ত অরু আসবে। কিন্তু পূজোর আগে অরুর চিঠি পেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন।

অরু লিখেছে, 'আমার খুব খারাপ লাগছে মা। কিন্তু জানোই তো এখন জরুরী অবস্থা। খুব গুরুতর কারণ ছাড়া ছুটি মঞ্জুরই করছে না। তাছাড়া এখন ছুটি নিলে রেকর্ডও খারাপ হবে। তবুও পূজোর সময় তোমার কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করছে।'

মিতুকেও লিখেছে সে কথা। 'এখানেও বাঙালীরা দুর্গাপূজো করো মিতু। তবুও পূজোর সময় বাড়ি বাড়ি মন করে। থাক্ গে, মন খারাপ করিস না আগামী পূজোয় আমি ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাবোই যাবো।

এখানে দিন একরকম কাটছে। সব প্রদেশের বন্ধু আছে। দিনরাত হৈ হৈ করছে। আর জানিস, আমি কাজের পরেও ইলেকট্রিসিটি নিয়ে একটু চর্চা করি। গবেষণাও বলতে পারিস। তাছাড়া ট্রেনিংএর পড়াও পড়তে হয়। কিন্তু ওদের তো তা সহ্য হবে না। যাহোক, বুঝিয়ে টুজিয়ে ওদের একটু শান্ত করেছি।'

মিতু চিঠি পড়ে ভাবে, ছোটদা পড়াশোনাই করতে পারল না। কি গবেষণাই বা করবে? ছোটদাই তো বলেছিল, এম এস-সি, পাশ না করলে গবেষণার কোনো মূল্যই নেই।

মিতু চিঠিতে তার ও মার সব কথা লেখে। বোম্বাই নারকেলের কথাও বাদ দেয় না।

'মনে পড়ে বোম্বাই নারকেলের কথা ছোটদাই তাকে একদিন বলেছিল। সে বিশ্বাস করেছিল। তাই দেখে অরু তার চুল টেনে দিয়ে বলেছিল, তুই একটা গাধা। নারকেল কি বাতাসের চেয়ে হাল্কা যে আকাশে উড়বে?'

মিতু বলেছিল, 'তবে এরোপ্লেন আকাশে ওড়ে কেন?'

অরু বক্তৃতা সুরু করে। মিতু সব শুনে তাকে বলে, 'আচ্ছা ছোটদা, তুই তো চুপচাপ জলের ওপর চিৎ হয়ে ভেসে থাকতে পারিস। সাঁতার না জানলে ডুবে যেতিস। তবে কি তুই বলতে চাস, সাঁতার শেখার পরে তুই জলের চেয়ে হাল্কা হয়ে গেছিস?'

বোনের প্রশ্নে অরু চুপ হয়ে যায়। সত্যিই তো! এমন কেন হয়? একথা কোনোদিন সে ভাবে নি। সে দিন রাত্রে অরুর ঘুম চলে গিয়েছিল।

পরদিন নিশীথবাবুকে জিজ্ঞেস করতে তিনি হেসে বলেছিলেন, 'বিজ্ঞানের অনেক নিয়ম অনেক দিক দিয়ে কাজ করে অরূপ। প্রকৃতিকে সব কিছুই মেনে চলতে হয়। এক নিয়ম মানতে গিয়ে ছুঁচকে জলে ভাসতে হয়, যা তোমার নিয়মে অসম্ভব। এই ছাখো—'

তিনি একটা জলের পাত্রে একটুকরো কাগজ ভাসিয়ে তার ওপরে একটা ছুঁচ রাখলেন। কাগজটা জলে ভিজে আস্তে আস্তে ডুবে গেল। ছুঁচটা ভাসতে লাগল।

নিশীথবাবু বললেন, 'সুতরাং—জানবে যে নিয়ম একে ডুবতে বলছে তার চেয়েও জোরদার কোনো নিয়ম একে ভাসিয়ে রেখেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্যিই নিয়মের রাজত্ব।'

পুজোর কটা দিন কেটে গেল। বিজয়া এল। মিতু এই কদিন কোথাও বেরোয় নি। মা কতবার বলেছেন।

সকালে মা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। পড়তে পড়তে বলে উঠলেন, 'ইস্!'

মিতু বলল, 'কি হলো মা, ছারপোকা কামড়ালো নাকি?'

মিতু অবশ্য জানে মা কাগজ পড়তে পড়তে কতবার ওরকম করেন। কোথায় বন্যা হয়েছে, কোথায় দুর্ঘটনা হয়েছে, সব খবর পড়তে পড়তেই মা মুখ দিয়ে এরকম শব্দ করবেন।

মা বললেন, 'আহারে, ছেলেটা! ছ'সাত বছর ধরে হাসপাতালে থেকে কাল মারা গেল। ছাখ্, ছবিও দিয়েছে। হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার নার্স নাকি চোখের জল ফেলেছে চন্দন মিত্র মারা গেলে।'

মিতু চিৎকার করে বলে ওঠে, 'কে? কি নাম বললে?'

মার হাত থেকে খবরের কাগজ কেড়ে নিয়ে সে পড়ে,—না, কোন সন্দেহই নেই। ঐ তো, ঠিক দুর্বার মতো মুখ।

মারও সব কথা মনে পড়ে যায়। মিতু তাঁকে বলেছিল চন্দনের কথা।

কাগজের অক্ষরগুলো মিতুর চোখের সামনে নাচতে থাকে। তারই মধ্যে মিতু পড়ে যায়—'হাসপাতালে থাকতে থাকতে হাসপাতালটাই চন্দনের কাছে বাড়ি হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা কেউ তার কাকু, কেউ মামু। নার্সরা দিদিমনি। অবসর সময়ে সে যা খেলত তাও অন্য রকমের খেলা। সে তার কাল্পনিক রোগীকে ইনজেকসন দিত, অপারেশন করত।'

বাইরে ঢাকের আওয়াজ ছাপিয়ে মিতুর কানে বাজে একটা গলার স্বর—'চন্দন না বাঁচলে আমিও বাঁচব না রে মিতা।' মিতুর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে।

বাস রাস্তায় যাওয়ার পথে একটা সাইনবোর্ড মিতুর চোখে পড়ে। তাতে লেখা আছে, 'আপনার রক্ত দান করে একটি অমূল্য জীবন বাঁচান।' একটা ছবিও আছে। একজন লোক শুয়ে আছে। তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মুখবাঁধা একজন ডাক্তার তার হাতে নল লাগিয়ে রক্ত বের করে নিচ্ছে।

'শয়তানের অট্টহাসি' নামে একটা বই মিতু পড়েছিল। তার মলাটে একটা খুনীর ছবি ছিল। ডাক্তারের ছবি দেখে মিতুর সেই ছবির কথা মনে পড়ে যেত। মিতু ভয়ে ওদিকে তাকাতো না।

আজ মামামামীকে বিজয়ার প্রণাম করতে যাওয়ার সময় ছবিটার দিকে ভালো করে তাকালো মিতু। হঠাৎ মনে হলো, ছবিটার পাশেই একটা ফর্সা কচিমুখ ভেসে উঠল। মুখবাঁধা ডাক্তারটার চোখদুটোও যেন হাসছে। এখন আর তাকে খুনী-খুনী লাগছে না। ঠিক যেন মামা মিতুকে দেখে তার গাল টিপে দিয়ে বলছেন, 'কিস্যু-ভয় নেই, কালই জ্বর ছেড়ে যাবে।' তবুও সেই হাসি-হাসি ভাব ছাপিয়ে, চোখ দুটোর মধ্যে যেন একটা 'বাবা-বাবা' উৎকণ্ঠার ছোঁয়া। মিতুর মনে হয়।

বিজয়ার চিঠির শেষে অরুকে লিখল, 'আচ্ছা ছোটদা, কাগজে পড়লাম বোম্বাইএ একটা কুকুরের শরীর থেকে হৃদপিণ্ড বদলিয়ে আরেকটা হৃদপিণ্ড লাগানো হয়েছে। এত হচ্ছে, কিন্তু কারো শরীরে রক্ত যদি এমনিতে না তৈরী হয়, কিছুতেই কি রক্ত তৈরী করা যাবে না? তাকে মরতেই হবে? তুই যদি ডাক্তার হতিস ছোটদা, তবে এই রোগের চিকিৎসা নিশ্চয় আবিষ্কার করতিস।'

তেইশ

মহারাষ্ট্রের একটি পার্বত্য সহর।

অরু তার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবে আজ প্রায় দেড় বছর সে চলে এসেছে মা-মিতুদের ছেড়ে। এর মধ্যে ভেবেছিল একবার কলকাতায় ঘুরে আসবে। কিন্তু কাজ আর পড়ার চাপে সময় করে উঠতে পারল না। আরো হয়ত ছ' সাতমাস থাকতে হবে। সে জানালা দিয়ে দূরের ছোট ছোট পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এই পাহাড়গুলোর মধ্যে দিয়েই হয়ত একদিন ছত্রপতি শিবাজী তার সৈন্যদল নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিলেন। পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল তাঁর গৈরিক পতাকা। কল্পনা করতে অরুর গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কয়েক মাইল দূরেই শিবাজীর জন্মস্থান।

ছোটবেলায় মিতুকে ঘুম পাড়ানোর সময় মা সুর করে গাইতেন—মিতু ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো বর্গী এলো দেশে। ছোট্ট অরু বোনকে আদর করতে করতে মাকে জিজ্ঞেস করত, 'মা, বর্গী কি?' মা বলতেন শিবাজীর কথা। অরু মনশ্চক্ষে দেখত এক অশ্বারূঢ় বীরের ছবি।

কলকাতায় থাকতে একবার অন্তদার সংগে একটা গলি দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ অন্তদা বলে, জানিস অরু এই গলিটার নাম কি? মারাঠা ডিচ লেন। বর্গী আক্রমণ রোধ করবার জন্যে একসময় এখানে পরিখা কাটা হয়েছিল।'

অরুর সামনে ভেসে উঠল সেই ছবি যা তার ইতিহাস বইএ বারবার দেখেছে। কানে বাজলো মার সুর করে গাওয়া ছড়া—বর্গী এলো দেশে।

অন্তদার কথায় অরু বাস্তব জগতে ফিরে এল। অন্তদা বলল, 'আমার এক বন্ধুর সংগে দেখা করে আসব। তুই যাবি নাকি অরু?'

অরু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ?'

অন্তদা বলে, 'এই কাছেই ! নন্দলাল বোস লেনে।'

রাস্তার নাম শুনে অরু চমকে ওঠে। অন্তদাকে কোনোমতে বলে, 'না, অন্তদা, আজ বাড়ি যাই।'

চুপ করে জানালার কাছে বসলেই সব কথা অরুর মাথার মধ্যে এসে ঘুরপাক খায়।

দীপুদা এর মধ্যে বোম্বাইএ আসেনি। ওর নটরাজ হোটেলটা বাইরে থেকে দেখে এসেছিল অরু। মেরিন ড্রাইভে ; অর্ধচন্দ্রাকার সমুদ্রের ধারে সুন্দর জায়গা। সারি সারি অট্টালিকা। রাত্রে আলো জ্বললে আরো সুন্দর লাগে। তখন ওকে বলে—রানীর হার।

অরু টেবিলের কাছে এসে চেয়ারটায় বসে। ড্রয়ারটা খুলতেই বেরিয়ে এল একটা ছবি। অরু মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে প্রশংসাপত্র নিচ্ছে। মারাঠী বন্ধু গোভিলকর তুলেছিল ছবিটা। ছবিটা কাগজেও বেরিয়েছিল।

অরু নিজেও ভাবতে পারে নি তার কথা এভাবে কাগজে উঠে যাবে। এমন কি কলকাতার বাংলা কাগজেও উঠেছিল। সে জানত না। মিতুই ডাকে পাঠিয়েছিল কাগজটা, খবরটাকে লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে। শিরোনামায় লেখা—'বাঙালী তরুণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।' রেলের দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য সে যে পরিকল্পনা করেছে—লাইন ভাঙা থাকলে বা সামনে অন্য কোনো ট্রেন থাকলে গাড়ী আপনা আপনিই যাতে থেমে যায় তার জন্য যে নক্সা করেছে তার কথা সংক্ষেপে খবরে দিয়েছে। সরকার পরিকল্পনাটির বিষয়ে ভাবছেন বলে জানিয়েছেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তার সংগে দেখা করে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন।

তবে অরুর কাছে সব কিছুর থেকে দামী পাশের খামটি। তার কৃতকার্মের খবরে মা আর মিতু একসংগে যে চিঠি দিয়েছিল সেটা সে যত্ন করে রেখেছে।

চিঠিটা খুলে আরেকবার পড়তে যাবে এমন সময় হৈ হৈ করে তার ঘরের সামনে এসে হাজির হলো—ম্যাথু, শ্রীনিবাসন, ভাটিয়া, মহান্তি, দেশাই, অনুপম রায়—ওরা সব।

অরু হেসে বলল, 'বাঃ। পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা সকলেই দেখছি হাজির। ব্যাপারটা কি ?'

অনুপম বলে, 'অ—অ—অ—'

ভাটিয়া তাকে থামিয়ে দিল। অনুপম অমনিতেই তোৎলা, উত্তেজিত হলে তো কথাই নেই।

এখানে এসে প্রথম দিকেই অরু অনুপমের কাছে একদিন গিয়েছিল একটা বই আনতে। অনুপমরা তাস খেলছিল। তাকে দেখেই খেলতে ডাকল। অরু বলল, এখনো তাস ভালো ভাবে চেনে না—লাল পান, কালো পান, থান ইঁট এইভাবে চেনে। বইটার কথা তুলতেই অনুপম বলেছিল—'ই—ইল্লে প্‌প্‌পোড়া।'

শুনে অরু রেগে গিয়েছিল। ভেবেছিল মুখপোড়া-জাতীয় কিছু গালি দিচ্ছে অনুপম। মেদিনীপুরের নীহার মাইতি বলল, 'ওর মানে হচ্ছে—কিছু হবে না, চলে না। তামিল ভাষায়। তবে অনুপমের কাছে ওর কোনো মানে নেই। ব্রে খেলার সময় কাউকে বিবি খাওয়াতে পারলেও ও ইল্লে পোড়া বলে লাফিয়ে ওঠে।

যাই হোক, অনুপমকে থামিয়ে ভাটিয়া ইংরাজীতে বলল, 'সুসংবাদ আছে বাসু। তুমি পরের মাসেই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছ। ওখানেই চাকরী হলো। এবার খাওয়াও।'

সংবাদটা পেয়ে অরু কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সে বলল, 'নিশ্চয় খাওয়াব। অর্ডার আসুক।'

অর্ডার আসল। অরু মাকে মিতুকে চিঠি লিখল। তবে কোন দিনটাতে রওনা হবে তা লিখল না। সে আচমকা মা মিতুকে অবাক করে দিতে চায়। চিঠি পেয়ে মা আর মিতুর আনন্দের রূপটা মনে মনে কল্পনা করতে

পারল অরু।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে খামের চিঠিটা আবার খুলল অরু। মার চিঠিভরা শুধু আশীর্বাদ, ভগবানের কথা, বাবা বেঁচে থাকলে আজ কত সুখী হতেন সে সব কথা। অরু চিঠিটা মাথায় ঠেকালো।

এর পরে মিতুর চিঠি খুলে পড়তে লাগল। মস্ত লম্বা চিঠি। পড়তে পড়তে মিতুর মুখটা সামনে ভেসে উঠল। লিখেছে—'কি রে ছোটদা, টমাস এডিসন এ যুগেও তাহলে জন্মায়। তোর খবরে যে কি আনন্দ হয়েছে কি বলব। কদিন ধরে শুধু লাফাচ্ছি। আর মার কথা কি বলব। মার ঐ এক কাজ—কান্না, আর ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠোকা। আমি তো রেগে গিয়েছি। এবার আমি ফার্স্ট হলে মা যখন কাঁদছিল, আমি বলেছিলাম—আমি ফার্স্ট হলেও কাঁদবে, ফেল হলেও কাঁদবে। তবে আর কষ্ট করে ফার্স্ট হই কেন? এবার থেকে ফেল করব। মা হেসে আমার মাথায় হাত নিয়ে বলেছিল, 'ওরে যখন মা হবি, তখন বুঝবি। এ দুঃখের কান্না না রে! এ কান্না যেন চিরকাল কাঁদতে পারি। আসলে আমার মনে হয় কি জানিস ছোটদা, আনন্দ হলে মার বাবার কথা, বড়দার কথা মনে পড়ে—তাই কাঁদে!'

আরো অনেক কথা লিখেছে মিতু। পাড়ার কথা, স্কুলের, কথা, এমন কি তাদের বেড়াল কাবলী গাড়ীর ধাক্কা লেগে পা খুঁড়িয়ে চলছে মিতু তার পায়ের কি রকম শুশ্রূষা করছে—সে কথাও লিখেছে। লিখেছে, 'তুই ফিরে এলে ওকে একবার বেলগাছিয়ায় নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আনিস ছোটদা।'

কলকাতা যাওয়ার দিন এসে গেল। ভাটিয়া, ম্যাথু সকলে মিলে তার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে দিল। বাক্সটা খুলে আরেকবার দেখে নিল অরু। বোম্বাই থেকে মিতুর জন্যে সাড়ী কিনেছে। একটা ছোট ছাতা। মার জন্যে কিনেছে বিছানার চাদর। বেশী কিছু কিনলে মা সন্দেহ করবেন, অরু বোধ হয় কিছু না খেয়ে টাকা জমিয়ে জিনিস কিনেছে।

কলকাতা মেল কল্যাণ ছাড়ল।

অরু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। আকাশে, পাহাড়ে, মাঠের মধ্যে যেন অনেকগুলো মুখ ভেসে উঠছে একের পর এক। অনুপম, ভাটিয়া ওদের ছবি মিলিয়ে যেতেই আরো অনেক মুখ এসে অরুর চোখের সামনে হাজির হচ্ছে। তাদের গলার স্বরও শুনতে পাচ্ছে অরু।

—'অরূপ, সত্যিকারের বিজ্ঞানী হও। বিজ্ঞানকে জানার চেষ্টা করো।'

—'যে যা চায় তাই কি হতে পারে অরূপ? আমি ঐ ঠেলাগাড়ীই হব।'

—'সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান আর ভালো লাগে না অরু।'

—'তোমরা মানুষ হলেই আমার গর্ব।'

—'অরু, নিজের মেরুদণ্ডটা চিরকাল সোজা রাখবি।'

মহারাষ্ট্র ছেড়ে মধ্যপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। দূরে দেখা গেল কোন এক দৈত্য লোহার চোয়াল উঁচিয়ে আছে রাতের আকাশে।

তার পাশে ঐ যে তারাটা জ্বলজ্বল করছে। ওটা কি? ধ্রুবতারা?

অরুর কানে বেজে উঠল মিতুর গলার গান—নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা। মনে এলো সেই ছোটবেলায় বাবার কাছে শোনা মালকোশের সুর—

আকাশে পাখী কহিছে গাহি,
মরণ নাহি, মরণ নাহি,

প্রেমের সুরে ভরা এ ভুবন
ব্যথা বেদন ভুলিল রে।
ফিরে চলো আপন ঘরে।

বাইরে গাড়ীর অবিশ্রান্ত শব্দ বেজে চলে—ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্।

—শেষ—

---

* অরুমিতুদের কথা আরম্ভ হয়েছিল বৈশাখ ১৩৭৬এ ( মে ১৯৬৯ )
* পুরোন সব কয়টি সংখ্যাই এখনও পাওয়া যেতে পারে।

---

# কোকিল পাখি

চুনী দাশ

কোকিল পাখি
বলবি নাকি
কোথায় পেলি গান ?
কে দিলে তোর
কণ্ঠে মধু
মন মাতানো তান ?
তোর গানে ভাই
ফুল ফোটে তাই
আমের মুকুল ফোটে,
তোরই ছন্দে
মধুর গন্ধে
মৌমাছি সব জোটে।
কোকিল পাখি
বলবি নাকি
হঠাৎ কোথা যাস্ ?
আবার এলে
যাস্‌নে চলে
থাকিস্ বারোমাস ॥

# সোনাই, সোনাভাই আর ঝুমকিসোনা

নিখিল বসু

ঠিক দুপুর বেলা। অচিনপুরের সাত মহলা প্রাসাদ নিঝুম নিশিরাতের মতই। সোনার পালঙ্কে মখমল শয্যায় রাজা রাণী সবাই ঘুমিয়ে। মন্ত্রী সেনাপতি ঝি চাকরগুলোও ঘুমোচ্ছে পড়ে। রাজকন্যা সোনাই পা টিপে টিপে উঠছে। সামনে সুন্দর কারুকার্য করা সোনার ছোট পালঙ্ক। সোনাভাই সেখানে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

'সোনাভাই সোনাভাই'

কানের ওপর কার আলতো ঠোঁটের ছোঁয়া পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসে সোনাভাই।

'দিদিভাই, তুই!'

'চটপট ওঠ,' পাকা গিন্নীর সুরে বলে সোনাই, 'জানিস্ কুঞ্জবাগানে না কত্তো গাছে কত্তো পাকা কুল ধরে রয়েছে। মিষ্টি যেন চিনি! যাবি?'

'কিন্তু দিদিভাই—মামণি যদি শোনে—'

'ইস্ ঠোঁট উলটে সব উড়িয়ে দেয় সোনাই, 'জানতে পারলে তো! আমরা এই যাব আর এই

আসব। আয় আমার সঙ্গে, বিরাট সিংহ দরজায় গোঁফওয়ালা দারোয়ানটাও ঘুমে ঢুলছে। নাক ডাকছে সিংহের ডাকের মতই। মুচকি হেসে দিব্যি সাহসীর মত সোনাই ওর গোঁফটাকে নেড়ে দিল। তারপর রাজপথে পা দিয়েই অবাক। পেছন পেছন কেউ যেন পা টিপে টিপে আসছে না! ওমা, এ যে দেখি সেই সাধের ঝুমকিটা। সাদা গা, পশমের মত নরম গরম বেড়ালটা। সোনাই আঙ্গুল তুলে ওকে শাসন করে, 'চোরের মত চুপি চুপি যাওয়া হচ্ছে আমাদের পেছন পেছন। তা বেশ, এসো। কিন্তু খবরদার কুল খেয়ে তারপর বাড়িতে ফিরে নালিশ করা চলবে না।'

ঝুমকি একবার ম্যাও ম্যাও করে ডাকে। লেজ নাড়িয়ে সায় দেয়।

রাজ্যের একেবারে শেষ সীমায় শুরু হয়েছে কুঞ্জবন। কত আম জাম জামরুল কুলগাছ গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। ওপাশে শাল শিমুল দেবদারু আর কনকচাঁপার গাছ। গাছের ডালে হলুদ রঙের পাখিরা কিচির মিচির করছে। বাতাসে চাঁপা ফুলের গন্ধ।

এপাশ ওপাশ চারপাশ দেখে ছটফট করে ওঠে সোনাভাই। কুঞ্জবনে গাছগুলো ঠিকই আছে, একটাতেও টোপাকুল নেই। এত সব কুল পেড়ে নিল কে? সোনাই-এর আপেল রাঙা মুখও হতাশায় শুকনো হয়ে উঠেছে।

'চল্ আমরা এগোই। প্রাসাদ থেকে যখন বেরিয়েছি অত সহজে ফিরছি না।'

গভীর বনের ভেতর ওরা ঢুকছে। গাছের পাতায় আর নীল আকাশটাকে দেখা যায় না। পেছনে লেজ নেড়ে ঝুমকিটাও আসছে! কত গাছ আর বুনো জন্তুরা পেরিয়ে গেল ওদের সামনে দিয়ে।

ডোরাকাটা বাঘ বলল, 'কে যায়? অচিনপুরের রাজপুত্তুর আর রাজকন্যা না?'

শুঁড় দিয়ে সেলাম ঠুকে হাতি বলল, 'টোপাকুল ত আছে তবে আরও অনেক দূরে। তোমরা এগিয়ে যাও সোজা উত্তরের দিকে'—

বনের একেবারে শেষ সীমায় এসে অবাক দুজনে। এখানে এত সুন্দর প্রাসাদটা বানাল কে? শ্বেতপাথরে তৈরী, ঝলমল করছে সূর্যের সোনা আলোয়। একপাশে দুধ ঢালা সরোবর আর একপাশে বিরাট বাগান। বাগানে সারি সারি কুলগাছ। পাকা পাকা কুলে ভরে রয়েছে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না। সোনাই বলল, 'তুই দাঁড়া, আমি ঢিল মেরে পাড়ি'।

সবে একটা ঢিল মেরেছে অমনি প্রাসাদ থেকে গমগম আওয়াজ বেরোতে লাগল—'কে রে আমার বাগানে?'

দুজনে চেয়ে দেখে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে হোঁতকা মোটা দাঁত উঁচু একটা রাক্ষস। কপালে সিঁদুরের টিপ, গলায় মানুষের মাথার খুলি দিয়ে তৈরী মালা। ওদের দেখেই হিহি করে হাসিতে ফেটে পড়ল। সোনাই ভয়ে ভয়ে বলল, 'তুমি হাসছ যে!'

রাক্ষস বলল, 'হাসব না! এত দিন পরে মানুষের গন্ধ পাচ্ছি। ইস্ জিব দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কচি পাঁঠার মাংস খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরেছে। কচি মানুষের মাংস যে কতদিন খাই নি। তোফা হবে, আজ এই ছোটোটাকেই সাবাড় করব।'

বলেই বুক চাপড়ে চাপড়ে গান শুরু করে রাক্ষসটা—

'কড়মড়িয়ে হাড় চিবাবো
রক্ত খাব চেটে
ইয়ে লা লা লা লা লা লা
ধেটে ধেটে ধেটে।'

মনের আনন্দে ধেই ধেই করে নাচে। বুক চাপড়ে চাপড়ে ধা ধিন ধিন ধা বাজায়।

সোনাই-এর দু চোখে জল—'ও রাক্ষস ভাই, তুমি আমাদের ছেড়ে দাও।'

কিন্তু হাতের মুঠোয় মানুষ পেয়ে ছাড়ে কোন রাক্ষস?

সোনাই চোখের জল মুছে বলল, 'বেশ, খাবে যদি তবে আমাকেই খাও। কিন্তু আমার সোনা-ভাইকে খেও না। ওর জন্য মা ভীষণ কাঁদবে।'

রাক্ষস বলল, 'তাই সই, তোর মাংসও কচি কচি আছে এখনও। মন্দ হবে না, কি বলিস?'

সবাই দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। কারুর মুখে কথা নেই। ঝুমকিটারও লেজ গোঁফ আর নড়ে না। সোনাই-এর চোখ গিয়ে পড়েছে বাগানের কুলগাছটার দিকে। মিষ্টি মিষ্টি রাশি রাশি টোপাকুল ধরে রয়েছে সেখানে। কম রাস্তা হাঁটতে হয় নি আজ। ক্ষিদে পেয়েছে ভীষণ। রাক্ষসটার পাল্লায় পড়ে ক্ষিদের কথা বেমালুম ভুলে ছিল। পাকা পাকা কুলগুলো দেখবার সঙ্গে সঙ্গে পেটে আবার ক্ষিদেটা চনচন করে উঠল।

রাক্ষস বলল, 'কি রে অমন ছটফট করছিস যে! ভয় করছে বুঝি?'

সোনাই ঢোক গিলে বলল, 'না, আমার ভী-য-ণ ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু না খেলে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

রাক্ষসটা বিকট সুরে হা হা করে হেসে উঠল। হাসির চোটে পায়ের নিচের মাটিটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

'ছাখো দিকিন মজা, আমার পেয়েছে ক্ষিদে তাই তোকে খাব চিবিয়ে চিবিয়ে। তোরও আবার সময় বুঝে ক্ষিদে পেল?'

সোনাই বলল, 'কি করি বল, ক্ষিদেটা যে মানা করলেও শুনছে না।'

রাক্ষস বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। আমারও যখন ক্ষিদে পায় রাগে অন্ধ হয়ে যাই। সামনে যা পাই খাওয়া শুরু করি। বাঘ ভালুকের হাড়গোড়, হরিণের শিংও বাদ দেই না। তোকে কি খাওয়াই বল্ তো? আমার ঘরে দুটো মরা হাতি, তিনটে ঘোড়া আর এগারোটা বাঘ আছে—ও আমার এক বেলার খাবার, ও সবের মাংস কি আর তোদের ভাল লাগবে!'

সোনাই বলল, 'উঁহু, বরং দেখলেই বমি হবে। তবে বাবা মাঝে মাঝেই হরিণ শিকার করে আনে। হরিণের মাংস মসলা দিয়ে রান্না করে খেতে মন্দ লাগে না।'

রাক্ষস বলল, 'ইস্ আবদার ছাখো, তোর জন্যে আমি এখন আবার হরিণ খুঁজতে বেরোই! তবে

হ্যাঁ'—রাক্ষসের মাথায় ফন্দী এল এতক্ষণে, 'কুল খাবি, পাকা টোপাকুল ?'

কুল ? জিব দিয়ে প্রায় জল গড়িয়ে এল সোনাই-এর। আনন্দে চোখদুটো ছলছল করে উঠল। ভুলে গেল একটু পরেই রাক্ষসের পেটে যেতে হবে। দু হাতে তালি দিয়ে ফিকফিক করে হেসে উঠল।

'ইস্ তাহলে কি মজাই হবে। দাও না পেড়ে, সোনাভাই-ও খাবে।'

এদিকে কিন্তু কথাটা বলেই চিন্তায় পড়েছে রাক্ষস। দেহটা তো আর তার কম ভারি নয়। পুরো সাড়ে চল্লিশ মন ওজন। কুল গাছটা তো ঐ টুকুন ! তার দেহের ভার অত ছোট গাছ সইতে পারবে না। কুল পাড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেই চিৎপাত হয়ে পড়বে। কিন্তু সে অক্ষমতা তো বাচ্চাদুটোর কাছে প্রকাশ করা যায় না। আচ্ছা, তবে ওদের আমার আরও একটা ক্ষমতা দেখাই। মনে মনে ভাবছে রাক্ষসটা।

'এই তোরা সব চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। ঘাবড়ে যাস্ না আমার কাণ্ড দেখে।'

বলতে বলতেই চোখের সামনে অত বড় রাক্ষসটা একটা ছোট্ট ইঁদুর হয়ে গেল। দেখতে না দেখ্‌তেই তরতর করে উঠে বসেছে গাছের মগডালে। পাকা পাকা টোপাকুল থরে থরে ধরে রয়েছে সেখানে। সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে ইঁদুরটা। সরু গোঁফ নেড়ে চেড়ে বলছে, 'দেখছিস্ তো রাক্ষসদের কেরামতিটা ? চোখের পলকে আমরা হাতি ঘোড়া বাঘ, রাজা মহারাজা স-ব হতে পারি। তোরা পারবি ?'

সব ব্যাপার দেখে তো সোনাভাই-এর দু চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। সোনাইও তাজ্জব। রাক্ষসটার বুদ্ধিও আছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সরু গাছের ডালে গিয়ে দাঁত দিয়ে কুটকুট করে বোঁটা ছিঁড়ে কুলগুলো নিচে ফেলে দিচ্ছে। মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে অজস্র পাকা কুল। বর্ষার জলকণার মতই।

'নে নে কত খাবি খেয়ে নে। তারপর তোকে খাব।'

গাছতলাটা কুলে কুলে ভরা। আনন্দে হাততালি দিয়ে কুড়োচ্ছে সোনাই আর সোনাভাই। সোনাই-এর সোনার জরির কাজ করা শাড়ির আঁচলটা কুলে ভরে এল। রাক্ষস গাছের ওপর থেকে বলল, 'হয়েছে, এবার লাফ দেব নিচে।'

সোনাই বলল, 'রাক্ষস ভাই, অত উঁচু থেকে লাফ দিতে তোমার ভয় করবে না ?'

রাক্ষস বলল, 'কেন, আমি তো এখন আর হোঁদল কুতকুত সাড়ে চল্লিশ মন ওজনের রাক্ষস নই। দিব্যি হালকা ছোট্ট ইঁদুর। চোখ বুজে হাওয়ায় ভেসে লাফ দেবো। তোরা সাবধান।'

বলতে বলতেই চোখের পলকে হাওয়ায় ভেসে নিচে লাফ দিয়েছে রাক্ষসটা। আর এদিকে হয়েছে আরও একটা কাণ্ড। তুলতুলে পশমের মত ঝুমকিটা এতক্ষণ চুপচাপ ওৎ পেতেই ছিল। চোখ বুজে রাক্ষসটা লাফ দেওয়ার আগেই সোজা দাঁড়িয়েছে গাছের নিচে। মুখ হাঁ করে রয়েছে। আর রাক্ষস পড়বি তো পড় ঝুমকির মুখেই। ইঁদুর-রূপী-রাক্ষসটা ঝুমকির গলা দিয়ে সটান পেটের ভেতর।

রাজকন্যাকে খাওয়ার সাধ চিরদিনের মত মিটল রাক্ষসের।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠছে সোনাই আর সোনাভাই-ও। আনন্দে ঝুমকিটাকে বুকে তুলে নিয়েছে। তুলতুলে পশমের মতো নরম দুই গালে নিজের ঠোঁট ছুঁইয়ে আদর করছে। আর চাই না কুঞ্জবাগানে আসতে। ভাগ্যিস ঝুমকি সোনা এসেছিল। নয়ত এক্ষুণি কিম্ভুত কিমাকার রাক্ষসটার পেটে যেতে হত। বাড়িতে ফিরেই আগে ঝুমকির গলায় সোনার ঝুমুর কিনে বেঁধে দেব। কোঁচড় ভরা টোপাকুল নিয়ে রাজকন্যা সোনাই আর সোনাভাই বাড়ির পথে চলল।

বিকেলের সূর্য তখন পৃথিবীটায় আবীরের রঙ ছড়াচ্ছে।

ওদের পেছন পেছন ঝুমকিটাও লেজ নেড়ে হেলেদুলে আসছিল।

---

# নেই-রাজ্য

**সাগরশংকর সেনগুপ্ত**

সকাল হুদের সাকিন আমায় বলতে পার কেউ ?
বৈকালেরি উল্টো দিকে দিচ্ছে কি তা ঢেউ ?
করলা, সেই ছোট্ট নদী জলপায়েরি মাঝে,
উচ্ছে নদী কোন্ দিকে বয় পাচ্ছি না ঠিক তা যে।
অজয় নদী পাচ্ছি মালুম, জয় নদীটি কই ?
ব্রহ্মজায়া নেই কি কোথা ? খুঁজতে সারা হই।
পদ্মা আছে, নেই গোলাপী ? দেখছি বালাসন,
বৃদ্ধাসনের নেই যে দেখা, খট্‌কাতে রয় মন।
মেঘনা আছে, রোদনা কোথায় ? বুঝতে নাহি পারি,
সিন্ধু আছে, কোথায় মরু ? আজব লাগে ভারী।
স্পষ্ট অতি চন্দ্রভাগা, সূর্যভাগা নেই ?
একদ্রু কই ? মরছি ঘুরে সেই সে ধাঁধাতেই।
বলতে পার তোমরা আমায়, এসব কোথা পাই ?
বললেটা কি ? সত্যি নাকি ? তিনভুবনে নাই ! !

# হরতাল

কল্লোল চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ় মাস, সারাদিন টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, লিপি, কেয়া, ডাবলু, ফনু দাদুকে ঘিরে বলছে, একটা গল্প বলনা দাদু!' দাদু জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গল্প শুনবি ··ভূত, দৈত্য, পরী না কি··· দাদুর কথা শেষ হতে না হতেই সবাই বলে ওঠে ওসব অনেক শুনেছি, আজকে ত হরতাল। তুমি আমাদের হরতালের গল্প বল। দাদু তাঁর টাকটা একটু চুলকে নিয়ে বলতে লাগলেন ;

• 'অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক রাজার গল্প শোনার খুব শখ ছিল তিনি রোজ রাজসভায় বসে গল্প শুনতেন। রাজার একজন লোক ছিল, সে রাজাকে সব সময় গল্প শোনাত। লোকটা কিন্তু একদম লেখা পড়া জানত না। সবাই তাকে ক্যাবলা বলে ডাকত, রাজসভায় অন্য কেউ গল্প বলত না!

কেন দাদু কেন ?— লিপি জিজ্ঞেস করে।

বলছি, বলছি, সব বলছি, রাজার হুকুম ছিল কেউ যদি গল্প বলতে বলতে থেমে যায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে শূলে চাপিয়ে দেওয়া হবে, তাই বুদ্ধিমান লোকেরা গল্প বলতে আসত না। তারা ভাবত বুদ্ধি খরচ করে গল্প তারা বলবে ? একশো, দুশো...তারপর ? ব্যস সব বুদ্ধি ফুরিয়ে যাবে। তখন ত তাদের মরতে হবে।

ক্যাবলা ছিল একদম বোকা। একটুও তার বুদ্ধি ছিল না, সে রোজ রাজসভায় রাজার পাশে দাঁড়িয়ে বোকচন্দরের মতো বকর বকর করত। সভা শুদ্ধ লোক ক্যাবলার গল্প শুনে হাসত। রাজাও হাসতেন।

রোজকার মত সেদিন রাজসভা বসেছে। রাজ্যের প্রজারা তাদের সুখ-দুঃখের কথা রাজাকে জানিয়েছে। এমন সময় 'ক্যাব্‌লা' বলে ডাকলেন রাজামশাই। ডাক শুনেই ক্যাবলা 'হুজুর' বলে ছুটে এল। বিরাট এক পেন্নাম করে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। রাজা বল্‌লেন 'ক্যাব্‌লা গল্প বল।' ক্যাবলা বলতে লাগল ঃ

দেবাদিদেব মহাদেব যুগ যুগ ধরে তপস্যা করে চলেছেন। তপস্যা করছেন বিরাট এক বটগাছের তলায়। সেই বটগাছটার মধ্যে দিয়ে খুব লম্বা এক তালগাছ আকাশ ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যুগ যুগ ধরে বটগাছটা আর তালগাছটা মহাদেবকে ঝড়-জলে আশ্রয় দিয়ে আছে বলে ব্রহ্মা গাছ দুটোর ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। সেইজন্যে গাছদুটোও অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিল।

একদিন এক মজার ঘটনা ঘটল। তালগাছের বহুদিনের বন্ধু এক কাক ছিল। অনেক দিন পরে সে তার ছানাপোনাকে নিয়ে তালের বাড়িতে বেড়াতে এল। অনেকদিন পরে দেখা হল দু'বন্ধুর। তালের আর আনন্দ ধরে না। সারাদিন তারা গল্পগুজব করেছে। এদিকে কাকের ছোট ছেলেটা

এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে একেবারে মহাদেবের জটার মধ্যে ফুরুৎ করে ঢুকে পড়ল। যেই না ঢোকা অমনি মহাদের তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কাকের বাচ্চাটা ভয়ে কেঁদে ফেল্‌ল। সে তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে জটায় আরও জড়িয়ে পড়ল। মহাদেব তখন টান মেরে বাচ্চাটাকে মেরে ফেল্‌লেন।

বটগাছের ডালে বসে একটা চড়াই পাখি এই ভীষণ দৃশ্য দেখেছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে তালের বাড়িতে সেই ভয়ানক দুঃসংবাদটা দিল। সব শুনে কাক হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। এর একটা প্রতিকারের জন্যে সে তালের হাতে পায়ে ধরাধরি করতে লাগল।

তাল বেচারা কি করে, অনেক ভেবে চিন্তে সে দড়াম করে একেবারে মহাদেবের ঘাড়ে পড়ল। আচমকা আঘাত খেয়ে মহাদেব দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে লাগলেন। একে তো সতীর দেহ বয়ে বয়ে গা-গতরে ভীষণ ব্যথা। তার ওপরে আবার তালের আঘাত একা এত যন্ত্রণা সহ্য করবেন কি করে?

তারপর কি হল দাদু?—চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করে কেয়া। দাদু বলতে থাকেন, মহাদেবকে এদিক ওদিক দৌড়-দৌড়ি করতে দেখে বিশ্বশুদ্ধ লোক তো অবাক্! একি হল? মহাদেব ছুটছেন ত ছুটছেন, তাঁর ছোটা আর থামে না। গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ। যতই হোক মহাদেব আমাদের দেবতা। শাপ দিলে আর রক্ষে নেই। পৃথিবীটা তা হলে একেবারে রসাতলে যাবে।

একটা পুষ্পক রথ আকাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মহাদেবের উড়ন্ত জটাতে পাক খেয়ে সেটা পড়ল একেবারে মাটিতে, লোকগুলো সব বেঘোরে মারা পড়ল। তারপর সব যানবাহন বন্ধ, পশুপাখিরা চুপচাপ। কি হয় কি হয় এমন একটা ভাব।

তাল কিন্তু মহাদেবকে ছাড়েনি। সে গড়িয়ে গড়িয়ে মহাদেবের পিছু পিছু ছুটে চলেছে। কেউ তাকে থামাতে পারছে না, সারা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা অচল। রাজা পড়লেন মহা ভাবনায় এরকম চললে তো রাজ্য-পাট ডকে উঠে যাবে, তিনি নগররক্ষীকে আদেশ দিলেন, বাণ মেরে তালের তিনটে মাথা তিনদিকে করে দাও, যেই না রাজার আদেশ পাওয়া সঙ্গে সঙ্গে নগররক্ষী বাণ মেরে তালের মাথা ফাটিয়ে দিল। তালটা ছট্‌ফট্ করতে করতে মারা পড়ল, দোকান-পাট, কোর্ট-কাচারি খুলল, গাড়ি-ঘোড়া চলতে লাগল। রাজ্যের অবস্থা স্বাভাবিক হল।

দাদু থামলেন, ফনু, ডাবলু জিজ্ঞেস করলো তারপর কি হল? দাদু বল্‌লেন মহাদেব আবার তপস্যায় বসলেন। বলে ক্যাবলা গল্প শেষ করল, সবাই গল্প শুনে চলে গেল, রাজাও খুসি হলেন।

লিপি প্রশ্ন করল—দাদু তুমি কি চালাক, হরতালের গল্প কোথায় বললে? দাদু বল্‌লেন ওইতো, মহাদেবের আর এক নাম হর, হরের পিঠে তাল পড়েই হয়েছিল হরতাল।

# পায়াভারি

**সঞ্জয় রায়**

হেড অফিসের বড়বাবু সবাই তাঁকে চিনি,
সেই যে সেবার গোঁফ হারিয়ে ভির্মি গেলেন যিনি।
আবোল-তাবোল ছন্দে যাঁহার কীর্তি লিখে খাতায়,
অমর হয়ে আছেন কবি ছড়া-ছবির পাতায়।
হঠাৎ দেখি সেদিন তিনি ত্রয়োদশীর ভোরে—
এক-পা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন আমড়াতলার মোড়ে।

মাথায় ছাতা, হাতে খাতা, কানে কলম গোঁজা ;
ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে আছেন চক্ষুদুটি বোজা।
দেখতে তাঁকে বিরাট রকম ভিড় করেছে সবাই.
খগেন নগেন জগমোহন গঙ্গারামের ক'-ভাই।
আত্মানাথের মেসো এবং চণ্ডীদাসের খুড়ো,
গোষ্ঠমামা, পাগলা জগাই, ভীষ্মলোচন বুড়ো।

যে যেখানে ছিল তারা সব এসেছে ছুটে।
দেখতে যারা পাচ্ছেনাকো দেখছে গাছে উঠে।
কি হয়েছে বড়বাবুর যাচ্ছেনা ঠিক বোঝা ;
কেউ ছুটেছেন হাসপাতালে কেউ এনেছেন রোজা।
হরেকরকম গবেষণা চলছে তাঁকে ঘিরে,
কেউ চেঁচিয়ে ফাটান গলা, কেউবা কহেন ধীরে—

'ব্যস্ত হবার নেই কিছু ভাই, জানি ওনার ধাত—
তেরোদশীর গেরোর ফেরে ঠিক বেড়েছে বাত!'
মুচকি হেসে বলেন কেশে আরেক মহাশয়—
'কী যে বলেন দাদা—হেঁ হেঁ—ওসব কিছু নয়।
বলছি শুনুন, ইচ্ছে হ'লে রাখতে পারেন লিখে—
'এক-পা তোলায়' নাম দিয়েছেন এবার অলিম্পিকে!'
'থামুন থামুন, বাজে কথা',—আরেক অভিমত—
'ত্রিকালজয়ী মহাপুরুষ,—জাতির ভবিষ্যত

ভাবেন কেবল যোগসাধনায় মগ্ন হয়ে উনি।
সিদ্ধযোগী 'এক-পা-বাবা', মস্ত বড় গুণী।'
'যোগী না ছাই,' 'রাখছি বাজি—পাগল নাতো খুনে—'
চোখ নামালেন বড়বাবু এসব কথা শুনে।

নাড়িয়ে মাথা উঁচিয়ে ছাতা বলেন তোদের ধিক্,—
একটা লোকেও বুঝলিনে হায় ব্যাপারখানা ঠিক।
মাথায় তোদের গোবরপোরা বলি কি আর সাধে?
বুঝতে হলে বুদ্ধি লাগে, রাধে কৃষ্ণ রাধে!
ইচ্ছে করে খাঁচায় ভরে পাঠাই তোদের রাঁচী।
মন দিয়ে শোন্, একপা তুলে দাঁড়িয়ে কেন আছি।

অনেক বছর আগের কথা, চাকরী নতুন পেয়ে--
আড়াই টাকা জমিয়েছিলাম একটি বেলা খেয়ে।
চীনে বাড়ির সস্তা জুতো তাই দিয়ে একজোড়া
নিয়ে এলাম কিনে সেবার—লাল কাগজে মোড়া।
বললে সবাই ভালই পেলে, টিকবে অনেক কাল ই।
সারিয়ে নিও সময়মত, লাগিও রোজ-ই কালি!

লাগিয়ে পালিশ তাপ্পি-তালি তিরিশ বছর ধরে
দিলাম পায়ে। আজকে হঠাৎ দেখছি হিসেব করে—
মাইনেগুলো সবই গেছে জুতো-সারাই খাতে।
এ্যাদ্দিনেতেও জমেনি তাই একটি টাকাও হাতে।
সারাই-সেলাই পালিশ-তালি এবং পেরেক ঠোকা,
নেই কোন ভুল এই খাতাতে সব রয়েছে টোকা।

দেখ্না এটা নিজের চোখেই। হিসেব আমার পাকা।
জুতো-জোড়ার দাম হয়েছে একশো উনিশ টাকা।
উঠুক পেরেক, লাগুক তালি, ছিঁড়ুক সেলাই সুতো;
কেমন করে চলবো পরে এমন দামী জুতো?
চললে আবার ছিঁড়বে শেষে, লাগবে ধুলো-কাদা।
তাই রেখেছি উর্ধ্বে তুলে। বুঝলি এবার হাঁদা?

ধারাবাহিক উপন্যাস

( সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানবার জন্য স্ট্র্যাটফোর্ড জাহাজ পাড়ি দিয়েছিল, তারপরে আর ফিরে আসেনি। এই অভিযানের নেতা ছিলেন মহাপণ্ডিত ডঃ ম্যারাকট ও জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপটেন হাওসি। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত প্রাণিবিদ মিঃ সাইরাস হেডলি, ইঞ্জিনিয়ার বিল স্ক্যানল্যান ও আরো ২৩ জন।

এক ঝুলন্ত খাঁচার মতন যন্ত্রের সাহায্যে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলায় এক গভীর খাদের ধারে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে এঁরা গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যান ও এক আশ্চর্য নগরীর সন্ধান পান। সমুদ্রগর্ভে বিশাল এক 'আশ্রয় সদনে' কৃত্রিম বাতাসের সাহায্যে জীবনধারণ করে উন্নত বিজ্ঞান সম্পন্ন এক জাতি—তাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া গেল। এরা প্রাচীন আটলান্টিসবাসীদের বংশধর।

মাণ্ডা, স্কার্পা, তাঁর মেয়ে সোনা ও বহু মেয়ে পুরুষদের সঙ্গে পরিচয় হল। এরা বেশ হাসিখুশি মানুষ। এরা চলচ্চিত্রের মতন পর্দায় চিন্তার প্রতিচ্ছবির সাহায্যে আগন্তুকদের কাহিনী শুনে নিল।

বাইরের দুনিয়ায় সংবাদ পাঠাবার জন্য ম্যারাকট আটলান্টিসের রসায়নবিদদের আবিষ্কৃত অতি হালকা লাঘবজান গ্যাসের সাহায্যে কাঁচগোলকের মধ্যে করে নিজেদের অভিজ্ঞতার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখে ভাসিয়ে দিলেন।

কাঁচগোলকের বার্তা ইউরোপে এসে পৌঁছবামাত্র তাঁদের উদ্ধারের জন্য একটি অভিযান বেরোয়। কয়েকটি কাঁচগোলকের সাহায্যে তাঁরা অনায়াসে ভেসে উঠে উদ্ধারকারী 'ম্যারিয়ন' জাহাজে আশ্রয় পান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন 'জলকুমারী' সোনা। )

## ( বারো )

"আটলান্টিক মহাসাগরের তলায় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করে' ফিরে আসবার পর অনেকেই আমাদের কাছে পত্র লিখেছেন—আমাকে ( অর্থাৎ অক্সফোর্ডের রোড্‌স্ স্কলার সাইরাস্ হেড্‌লেকে ) প্রফেসর ম্যারাকটকে,

এমন কি বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান্‌কেও। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের ২০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি জায়গায় আমরা সমুদ্রের ভিতর নামি এবং তার ফলে কেবল যে গভীর সমুদ্রের প্রাণী ও জলের চাপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলেছে তাই নয়, এও সাব্যস্ত হয়েছে যে একটি পুরাতন সভ্যতা অসম্ভব রকম কঠিন অবস্থার মধ্যেও আজ পর্যন্ত টিকে আছে। সমুদ্রের তলা থেকে পাঠানো আমার বিবরণীতে যা যা লিখেছি তা যদিও ভাসা ভাসা ধরনের তবু প্রায় সব কথাই তাতে আছে। কোনো কোনো বিষয় অবশ্য তাতে লেখা হয়নি। তার মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য প্রভু ঘোরদর্শনের কথা। সে কথা এতই অবিশ্বাস্য রকমের অদ্ভুত যে আমাদের মনে হয়েছিল যে তখনকার মত সে সব কথা না জানানোই ভাল। তবে এখন, যখন বিজ্ঞানীরা আমাদের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছেন আর সমাজ গ্রহণ করেছে আমার আটলান্টিয় বধূকে, তখন সে কাহিনী হয়ত সাহস করে' সকলের কাছে বলা যেতে পারে। সত্যিই ডাঃ ম্যারাকটের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের দরুণ আমরা সেখানে এমন কীর্তি রেখে আসতে পেরেছি যাতে আমাদের কথা তাদের ইতিহাসে কোনও দেবতার আবির্ভাব বলেই হয়ত লেখা থাকবে। আমরা যে চলে' আসব সে কথা তারা জানত না, জানলে খুব সম্ভব আসতে দিত না। হয়ত এর মধ্যেই সেখানে লোকের মুখে মুখে একটা কিংবদন্তী দাঁড়িয়ে গেছে যে আমরা স্বর্গ থেকে গিয়েছিলাম আবার স্বর্গেই ফিরে এসেছি, সঙ্গে করে' নিয়ে এসেছি তাদের সব চাইতে মধুর, সব চাইতে সুন্দর ফুলটি।

'যাই হোক্, প্রভু ঘোরদর্শনের কাহিনী বলবার আগে আরো কতকগুলি অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলব। সত্যিই এক এক সময় মনে হয় ম্যারাকট দ্বীপে আরো কিছুদিন থাকলে হত, বহু রহস্য ছিল সেখানে।

'একদিন হঠাৎ সতর্কতার সাড়া পড়ে গেল আর আমরা সবাই অক্সিজেনের মুখোস পরে' সমুদ্রতলে ছুটে গেলাম। আমাদের আশে পাশে অন্য সকলের মুখে আতঙ্কের ছাপ এত স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল যে আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে কোনো সাংঘাতিক বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলাম কয়লার খনির সেই গ্রীক শ্রমিকেরা পড়ি মরি করে' ছুটতে ছুটতে আমাদের উপনিবেশের দরজার দিকে চলেছে। বুঝলাম যে আমরা যারা বাইরে এসেছি তাদের কাজ হচ্ছে এদের যত শীঘ্র সম্ভব ভিতরে নিয়ে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত সবাইকে যখন ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল তখন একবার চারদিকে তাকিয়ে ভয়ের কারণটা কি বোঝবার চেষ্টা করলাম। দূরে কেবল এক জোড়া সবুজ সবুজ ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। প্রত্যেকটারই মাঝখানটা উজ্জ্বল আর ধারগুলি ভাঙা ভাঙা, অস্পষ্ট, যেন দুই টুকরো মেঘ। মেঘের মতই সে দুটো আমাদের দিকে ভেসে আসছিল। তখনও সে দুটো প্রায় আধ মাইল দূরে, কিন্তু আমাদের সঙ্গীরা মহা আতঙ্কে আমাদের নিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে ঢুকলেন। দরজার মাথার উপর স্বচ্ছ স্ফটিকের একটা দশ ফুট লম্বা আর দুই ফুট চওড়া মস্ত চাঁই রয়েছে। বাইরের দিকে আলো ফেলার ব্যবস্থাও আছে। উপরে উঠবার সিঁড়ি ছিল। আমরা কয়েকজন তাই বেয়ে উঠে স্ফটিকের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। দেখলাম সেই অদ্ভুত ঝিকমিকে সবুজ আলোর কুণ্ডলী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার পর তাদের একটি সেই স্ফটিকের জানালা বরাবর উঁচুতে উঠতে লাগল। মনে হল যেন একটা আলোর শিখা কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠে আসছে। তখনি আমাদের সঙ্গীদের একজন আমাকে টেনে দৃষ্টি-রেখার নীচে নামিয়ে দিল, কিন্তু আমার মাথার কয়েক গাছি চুল হয়ত তখনও জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, সেই কয়গাছি চুল আজ পর্যন্ত শুকনো রং-চটা গোছের হয়ে আছে। ভয়ের নানান সুরে বলা 'প্র্যাক্সা' কথাটার থেকে বুঝলাম যে সেইটাই সেই অদ্ভুত জীবের নাম। একমাত্র লোক যিনি এই ব্যাপারে পেলেন আনন্দের খোরাক তিনি প্রফেসর ম্যারাকট্! একখানি ছোট জাল আর একটি কাচের পাত্র নিয়ে তিনি তখনই বেরিয়ে পড়েন আর কি! অনেক কষ্টে তাঁকে এই পাগলামি থেকে নিরস্ত করা গেল। তাঁর

মন্তব্য : 'এ একটি নূতন প্রাণিপর্যায়, এর কতক অংশ জৈব আর কতক গ্যাসীয়, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় তার বুদ্ধি বৃত্তি আছে।' স্ক্যানল্যানের মন্তব্য ঠিক একটা বৈজ্ঞানিক মত নয়, সে বললে, এটা জাহান্নমের আজব খেয়াল।'

'এর দুই দিন পরে একবার সমুদ্রতলে বেড়াতে বেরিয়ে আমরা একজন কয়লা-শ্রমিকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম। বেচারা পালাতে পারেনি, ফলে সেই প্রাণী দুটির পাল্লায় পড়েছিল। দেখলাম তার কাচ-গোলকটি ভেঙ্গে গেছে। এতেই বোঝা গেল সেই বায়বীয় জীবের দেহে কিরকম শক্তি। লোকটির চোখ দুটি কেবল তারা উপড়ে নিয়েছিল, শরীরের আর কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই।

'ফেরবার পরে ম্যারাকট বললেন, 'বড় খোশ-খোরাকী জীব! নিউজিল্যাণ্ডে এক জাতের শিকারী টিয়া আছে তারা ভেড়ার ছানা শিকার করে কেবল তার পেটের ভিতরে একটা বিশেষ জায়গার চর্বিটুকু খাওয়ার জন্য। তেমনি এই জীব মানুষ মারে কেবল চোখদুটির জন্য!'

'আর একটি অদ্ভুত জন্তুর কথা বলি। অনেক সময় আমরা দেখতাম সমুদ্রতলের নরম পাঁকে কিসে যেন লম্বা দাগ কেটে গেছে, যেন একটা পিপে গড়িয়ে গড়িয়ে গেছে। সেটা কি হতে পারে জিজ্ঞাসা করাতে আমাদের আটলান্টিয় বন্ধুরা জিবে আর টাকরায় ঠেকিয়ে যে আওয়াজ আমাদের শোনালেন ক্রিক্স্ চক্ বললে হয়ত তার কতকটা কাছাকাছি আসে। তার চেহারাটা মোটামুটি কিরকম তাও জানতে পারলাম তাঁদের সেই আশ্চর্য চিন্তা প্রতিফলকের কল্যাণে। প্রফেসর সেটাকে কেবল এক জাতের খোলকহীন সমুদ্রের শামুকের এক বিরাট্ সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না। একটা অতিকায় শুঁয়ো পোকার মত তার চেহারা, সমস্ত শরীরটা মোটা কর্কশ শুঁয়োর মত লোমে ঢাকা, কিন্তু চোখ দুটি দু খানি লম্বা বোঁটার আগায় বসানো। আমাদের বন্ধুদের ভাবে বুঝলাম সেটা একটা অতি ভয়ঙ্কর জানোয়ার।

'কিন্তু প্রফেসর ম্যারাকট্‌কে যে জানে তার হয়ত বুঝতে বাকি নেই যে এতে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহলকেই আরো উসকে দেওয়া হল। এই অজানা উদ্ভট প্রাণীটি ঠিক কোন প্রজাতি ও উপ-প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সেটা স্থির করতে না পারা অবধি তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না। আবার যখন একদিন সাগর তলে আমরা সেই জন্তুর স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেলাম তখন তাঁকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না, যে আগ্নেয়শিলার ঢিবি আর আগাছার জঙ্গলের ভিতর থেকে চিহ্নটা বেরিয়েছিল বলে' মনে হল সোজা সেই দিকে চলতে সুরু করলেন। সেদিককার এবড়ো খেবড়ো জমিতে অবশ্য আর সে চিহ্ন আমরা দেখতে পেলাম না, তবে স্বাভাবিক পালার মত একটা খদ দেখতে পেলাম যেটা মনে হল সেই কিম্ভুত জনোয়ারের বাসায় গিয়ে উঠেছে। আমাদের তিনজনেরই হাতে আটলান্টিয়দের সেই বল্লম ছিল, কিন্তু অজানা বিপদের সঙ্গে যুঝবার পক্ষে সেগুলো যে খুব কাজের হবে তা আমার মনে হচ্ছিল না। যাই হোক প্রফেসরকে তো আর একা যেতে দিতে পারি না, কাজেই তাঁর পিছন পিছন যাওয়া ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর ছিল না।

'সেই আগাছার জঙ্গলের মধ্যে কত রকমের ছোট ছোট জীব, তাদের কত রকমের রঙ। সেগুলি দেখতে যত সুন্দর বিজ্ঞানীদের দেওয়া তাদের নামগুলোও ততই দাঁতভাঙ্গা! চড়াই ভেঙ্গে আমরা উপরে উঠছিলাম আস্তে আস্তে, হঠাৎ দর্শন পেয়ে গেলাম আমরা যাকে খুঁজছিলাম তার। সে চেহারা দেখে মনে যে খুব ভরসা পেলাম তা নয়।

'আগ্নেয় শিলার মধ্যে একটা ফাটলের ভিতর থেকে তার শরীরটা অর্ধেক বেরিয়ে রয়েছে। প্রায় ফুট পাঁচেক লোমশ দেহ আমাদের নজরে পড়ল। তার চোখ দুটি এক একটি পিরিচের মত বড়, হলদে রঙের কোনো দামী পাথরের মত জ্বল জ্বল করছে। আমাদের আওয়াজ পেয়ে সেই চোখ দুটো তাদের লম্বা লম্বা দুই বোঁটার

উপর আস্তে আস্তে আমাদের দিকে ফিরল। তার পর জন্তুটা ঠিক শুঁয়ো পোকার মত ভঙ্গীতে শরীরটাকে ঢেউ খেলিয়ে আস্তে আস্তে তার গর্ত থেকে বেরুতে লাগল। আমাদের ভাল করে' দেখবার জন্য একবার মাথাটা প্রায় ফুট চারেক উঁচুতে তুললে, তখন লক্ষ্য করলাম তার গলার দুই পাশে টেনিস্ জুতোর তলার মত ঢেউ-তোলা দুটি জিনিস লাগানো। সেটা যে কি হতে পারে ভেবে পেলাম না। তখন জানতাম না যে একটু পরেই হাতে নাতে সেটা জানতে হবে!

"ডাঃ ম্যারাকট ততক্ষণে তাঁর বল্লমটি বাগিয়ে ধরে টান হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর মুখের ভাবে অতিশয় দৃঢ় সংকল্প সুপ্রকাশ। স্পষ্টই বুঝলাম প্রাণিবৃত্তান্তের একটি দুর্লভ নমুনা দেখতে পেয়ে তাঁর মন থেকে সমস্ত ভয় মুছে গেছে। স্ক্যান্‌ল্যান্ আর আমি আর কি করব, দুজনে তাঁর দুপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। জন্তুটা কিছুক্ষণ আমাদের দিকে সেইভাবে চেয়ে থেকে তারপর পাহাড়ের ঢালু বেয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে আসতে সুরু করল, মাঝে মাঝে সেই দুটি বিরাট চোখ তুলে দেখে নিচ্ছিল আমরা কি করছি। সেটা এত আস্তে আস্তে আসছিল যে আমাদের মনে হল যখন ইচ্ছা আমরা তাকে পিছনে ফেলে দৌড় মারতে পারি। কিন্তু আমরা যে মৃত্যুর অতি নিকটে দাঁড়িয়ে আছি তা যদি তখন জানতাম।

আমাদের কাছ থেকে সেটা যখন আরও ষাট গজ খানিক দূরে আছে এমন সময় একটা বড় জাতের মাছ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আস্তে সাঁতরে সেই জন্তু আর আমাদের মাঝামাঝি এসে হাজির হল। তারপর হঠাৎ জল তোলপাড় করে এক লাফ মারলে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের সারা শরীরে একটা তীব্র যন্ত্রণা বোধ করলাম। সমস্ত শরীর ঝমঝম করে উঠল, হাঁটু দুটো যেন ভেঙ্গে পড়ার মতো হল। চেয়ে দেখি মাছটা উলটে গিয়ে আস্তে আস্তে নীচে এসে পড়ল, তার মধ্যে আর জীবনের লক্ষণ নেই। বৃদ্ধ ম্যারাকট যেমন অসমসাহসিক তেমনি আবার সতর্কও বটে। তিনি নিমেষের মধ্যে বুঝে নিলেন ব্যাপারখানা কি। আমরা যে জীবের মোহড়া নিয়েছি সে আপন খাদ্য শিকার করে বিদ্যুতের ঢেউ হেনে! আমাদের বল্লম কামানের সামনেও যা এর সামনেও তাই। যদি দৈবাৎ মাছটা মাঝে পড়ে জন্তুটার বিদ্যুৎ বাণ নিজের উপর টেনে না নিত তাহলে এতক্ষণ আমাদের ঐ মাছের দশাই হত। আমরা পড়ি মরি করে দৌড়াতে লাগলাম আর দৌড়াতে দৌড়াতে এই সংকল্প করলাম যে অতঃপর এই অতিকায় সমুদ্রকীটটিকে কঠোর নিঃসঙ্গতার মধ্যে ফেলে রাখা হবে।

এইসব হল সমুদ্রের অতি গভীর অঞ্চলের বড় বড় বিপদের কয়েকটি। আরও একটি হচ্ছে একরকম ছোট মাছ, প্রফেসর যার নাম দিয়েছেন ঔদক হিংস্রক। মাছগুলি লাল রঙের, হেরিং মাছের চেয়ে খুব বেশী বড় হবে না। মুখটা বড় আর তাতে সাংঘাতিক দুই সারি দাঁত। এমনিতে সেগুলি নিরীহ, কিন্তু কোথাও সামান্য রক্তপাত হলেই—সে যত সামান্যই হোক—অমনি তারা এসে জোটে। তখন আর কোনো উপায় নেই, ঝাঁকে ঝাঁকে সেই মাছ এসে তাকে চক্ষের পলকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে। আমরা কয়লার খনিতে একবার এইরকম এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছিলাম। একজন শ্রমিকের হাত কি করে একটু কেটে গিয়েছিল, অমনি চারিদিক থেকে হাজার হাজার মাছ তার উপরে এসে পড়ল। সে নিজে আর তার সঙ্গীরা তাদের হাতের গাঁইতি আর কোদাল দিয়ে সেগুলোকে মেরে তাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা! দেখতে দেখতে বেচারার কাচের পোষাকের বাইরের শরীরটা সেই মাছ কিলবিল জলের মধ্যে যেন মিলিয়ে গেল, শুধু সাদা সাদা হাড়গুলো বেরিয়ে রইল। ক্রমশঃ

---

* ম্যারাকট ডীপ সুরু হয়েছিল পৌষ ১৩৭৫এ ( জানুয়ারী ১৯৬৯ )

* পুরোন সংখ্যাগুলি সবই পাওয়া যায়।

# সব ঝুট্ হ্যায়

## অচিন্ত্য চক্রবর্তী

সদা কর্মব্যস্ত প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর স্বভাবে একটি ছেলেমানুষি লুকিয়ে ছিল। অন্তরঙ্গদের কাছেই ওঁর এই রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ত। এ সম্পর্কে আজ একটি ঘটনা বলছি—সাংবাদিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে।

সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে উনি গিয়েছিলেন ইন্দোরে। সম্মেলন সমাপ্তির পর হঠাৎ স্থির করলেন একদিনের জন্য, রাজনৈতিক কোলাহল থেকে দূরে থাকবেন এবং লোকালয়ের বাইরে একান্তে অবসর বিনোদন করবেন।

'যথেষ্ট গোপনীয়তা' সত্ত্বেও জানা গেল, ইন্দোর থেকে কয়েক মাইল দূরে মানডুর আশেপাশে বেড়াতে যাবেন। সঙ্গে যাবে ওঁর দুই দৌহিত্র—রাজীব ও সঞ্জীব।

ঐ অঞ্চলটি বেড়ানোর পক্ষে সত্যিই চমৎকার। ইতিহাসের বৃত্তান্ত ও নানান কিংবদন্তীতে একে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

মানডুতে পৌঁছনর পর, অভ্যর্থনা পর্ব শেষ হলে, জনৈক প্রবীন গাইড ( পরিদর্শক ) ভার নিলেন দর্শনীয় সব কিছু পণ্ডিতজীকে দেখানোর। খাঁ সাহেব নামে পরিচিত, শুভ্রকেশ এই ভদ্রলোকটি তাঁর বিচিত্র পোষাক দেখিয়ে এবং বচনচাতুর্যে সহজেই জমিয়ে ফেললেন।

হিন্দু-মুসলমান রাজা-রাণীর নানান কীর্তির স্মৃতিবিজড়িত পুরণো রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, সরোবর ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। সাবলীল ভঙ্গীতে কখনও মারাঠী ছড়া, কখনও সংস্কৃত শ্লোক অথবা ফারসী বয়েৎ আবৃত্তি করে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করলেন যে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত অনেকেই যেন অতীতের দিনগুলিতে ফিরে গেলেন! পণ্ডিত নেহরু সসম্ভ্রমে খাঁ সাহেবের কথা শুনছিলেন। মনে হল বেশ উপভোগ করছেন। মাঝে মাঝে দু-একটা কৌতূহলী প্রশ্ন করছিলেন।

ঘুরতে ঘুরতে তিনটি পাহাড়ের প্রায় সংযোগস্থলে একটি জায়গায় এসে দেখালেন একটা echo point.

এখান থেকে দাঁড়িয়ে সামনের পাহাড়ের দিকে চেয়ে আওয়াজ করলেই অল্পক্ষণের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

খাঁ সাহেব বললেন,

'রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দিষ্টা এক রাণী আজও পাহাড়ের কোলে রয়েছেন। ওঁর চোখে ঘুম নেই। রাত্রে কখনো কখনো বীণার সুরের সঙ্গে তাঁর মধুর কণ্ঠসঙ্গীত ভেসে আসে।'

উনি জানালেন যে কারও মনে প্রশ্ন জাগলে—এই echo point'এ দাঁড়িয়ে রাণী-মার উদ্দেশ্যে বললেই তিনি সঠিক উত্তর দিয়ে দেবেন! মুহূর্তের মধ্যেই যে জবাব পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোনো

সন্দেহ নেই।

ইতিপূর্বে খাঁ সাহেব নাকি ওয়াভেল, মাউন্টব্যাটেন ইত্যাদি বড়লাট এবং অনেক রাজামহারাজাকে ওখানে এনেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই রাণী-মার কাছ থেকে সঠিক উত্তর পেয়ে খুসি হয়ে গেছেন।

জওহরলালকে উনি অনুরোধ করে বললেন, 'পণ্ডিতজী, আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে বিনা সঙ্কোচে প্রশ্ন করতে পারেন।'

একটু ইতস্ততঃ করে নেহরু সামনের পাহাড়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন :

—'কেয়া, রাজীব অউর্ সন্‌জীব আচ্ছা লেড়কা হ্যায় ?'

একটু পরেই পরিষ্কার শোনা গেল :

—'আচ্ছা লেড়কা হ্যায়।'

বেশ খুসি হয়ে খাঁ সাহেব পণ্ডিতজীকে বললেন, 'দেখলেন ত স্যার। কেমন সাফ জবাব। আরও কিছু জানতে চাইলে প্রশ্ন করতে পারেন।'

'কেয়া, খাঁ সাহেব সাচ্চা আদমি হ্যাঁয় ?,

'মুহূর্তের মধ্যে আওয়াজ হল,

'সাচ্চা আদমী হ্যাঁয়।'

আরও উৎসাহ নিয়ে এবারে খাঁ সাহেব জওহরলালকে বললেন যে তৃতীয় প্রশ্নের জবাব সব চেয়ে মূল্যবান।

তখন নেহরুজী বেশ জোরে—যাতে সবাই শুনতে পায় এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,

—'কেয়া, গাইড সাহব যো কুছ্ বোল রহেঁ হ্যাঁয়, সব ঝুট্ হ্যায় ?'

প্রতিধ্বনি হল : 'সব ঝুট্ হ্যায়।' জবাব শুনে খাঁ যেন চুপসে গেলেন—। মুখে কোন কথা নেই। পণ্ডিতজীর চোখে দুষ্টুমীভরা হাসি।

---

# পুস্তক পরিচয়

## কল্যাণী কার্লেকার

### হাসির ঘণ্ট—যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রকাশক—মনীষা গ্রন্থালয়, ৪।৩বি বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা ১২। দাম ২'৫০ পঃ

ছড়ার বই। গ্রন্থকার ভূমিকা করেছেন 'বেঁচে থাকবার এই জটিল সংগ্রামের মধ্যে' 'এই উদ্ভট রসের ধারায়' মনটা ভিজিয়ে নেন। তাঁর রস কখন উদ্ভট, কখন অদ্ভুত, কখন হাসিঠাট্টায় ভরা। ছন্দ সাজে, নির্ভুলভাবে বয়ে চলেছে, মিল আর অনুপ্রাসে ছড়ার আওয়াজ নেচে উঠছে। অনেকগুলো ছড়ায় এই ক্ষেত্রে পুরনো লেখকদের ভাব ও ভাষার ছাপ পাওয়া যাচ্ছে, আর কয়েকটা নোতুন সার্থক সৃষ্টিও আছে।

ছেলেপিলেরা আবৃত্তি করে খুশি হবে।

## কলানবগ্রাম

### মিঠু মুখার্জী

গ্রাঃ সং ২১২১, বয়স ৮½ বছর

আমরা ২৮শে মার্চ বাসে করে কলানবগ্রাম গিয়েছিলাম, আমাদের বাস গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে ছুটে চলল। পথে যেতে একটা পুলিস লাইন দেখলাম। পুলিস লাইনে অনেক পুলিস থাকে। যখন আমরা কলানবগ্রামের কাছে এসে পড়লাম, তখন দেখলাম—পথের দুধারে হাট বসেছে। হাটে কুমড়ো আর বাঁধাকপি বেশি ছিল। তারপর আর একটু দূর যেতেই আমরা কলানবগ্রামে পৌঁছে গেলাম, কলানবগ্রামের একটা আশ্রমে একটু বিশ্রাম করেই কলানবগ্রামের দৃশ্য দেখতে বেরোলাম। আমরা পরপর বুনিয়াদিস্কুল দেখলাম। কারুকর্মশালায় ছেলেরা কাঠের খেলনা বানাচ্ছিল। কলাভবনে ছোট ছেলে-মেয়েদের আঁকা সুন্দর ছবি ও মূর্তি আছে। যাদুঘরে গিয়ে দেখলাম—সেখানে নানারকম মরা সাপ, সাপের ডিম, বিছে, নানারকম মাছ, মুরগির ডিম, ছাগলছানা, নানারকম পোকা পাখির বাসা, কাঠবিড়ালের বাসা, কাঠের টুকরো ও ধান রয়েছে। সেখান থেকে আমরা আবার আশ্রমে ফিরে এলাম। পথে বাঁদরনাচ দেখলাম। তারপর ওখানেই সিমচচ্চড়ি, ডাল, আলুরদম, আলুভাজা মাছ ও দুধভাত খেয়ে বিশ্রাম করে বিকেল ৩টার বাসে আবার বর্ধমানে ফিরে এলাম।

## "লটারী"

### অনামী রায়

বয়স ১১, গ্রাঃ সং—২১৯৪

এক ভদ্রলোক একবার লটারীর টিকিট কিনেছিলেন। তিনি ছিলেন হার্টের রুগি। ডাক্তার বলেছিলেন তাঁকে এমন কোন সংবাদ না দেওয়া হয় যাতে তাঁর উত্তেজনা হয়। এই রকম সংবাদে হার্টফেলের আশংকা আছে।

এখন সেই ভদ্রলোকের নামে লটারিতে দুইলাখ টাকা উঠেছে। ভদ্রলোকের ছেলেরা গিয়ে ডাক্তারকে সব কথা বলে এনেছে। কারণ এখন বাবাকে এই কথা বললে তিনি হার্টফেল করবেন।

ডাক্তার বললেন সংবাদ আমি দিয়ে দেব তবে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ডাক্তার ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে একথা সেকথা বলবার পর বললেন—'আচ্ছা আপনি যদি লটারীর টাকাটা পান তাহলে টাকাটা দিয়ে কী করবেন?' ভদ্রলোক বললেন—'আরে দূর্, আমি লটারীর টাকা কোথেকে পাবো!' ডাক্তার—'যদি পান তাহলে কী করবেন।' ভদ্রলোক—'আরে দূর্, আমি পাবো না।'

ডাক্তারও নাছোড়বান্দা, রুগি যত না-না করেন ডাক্তার তত চেপে ধরেন। শেষে আর না পেরে ভদ্রলোক বললেন—'যদি পাই তাহলে আপনাকে সব টাকা দিয়ে দেব।'

ডাক্তার এমনি এমনিই দুই লাখ টাকা পেয়ে যাবেন, শুনে ডাক্তার নিজেই তখনই হার্টফেল্ করলেন!

## মহাবালেশ্বরে কয়েকদিন

বন্দনা মজুমদার

বয়স—১২, গ্রাহক নং—২১৯০

১৯৬৭ সালের গরমের ছুটিতে আমরা মহাবালেশ্বর যাব বলে ঠিক করলাম।

৫ই জুন ভোর ৬টার সময় আমরা লাক্সারী বাসে করে বোম্বে থেকে মহাবালেশ্বর রওনা হলাম। প্রথম প্রথম খুব ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু তারপর বাস যখন খোলা রাস্তার ওপর দিয়ে চলতে লাগল তখন উৎসাহে উঠে বসলাম।

এরপরে আমাদের বাস তিন চারটে বাস স্টেশনে থামল, প্রায় এক ঘণ্টা যাবার পর কি রকম ঠাণ্ডা লাগতে লাগল, জানলা দিয়ে দেখলাম বাস খাড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠছে। দুধারে সিলভার ওকের সারি, তার মাঝখান দিয়ে আমাদের বাস আস্তে আস্তে চলতে লাগল। দূরে দেখতে পেলাম পাহাড়ের ওপর ছোট ছোট ঘরবাড়ি।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ আমরা মহারাষ্ট্রের শৈলাবাসের রানী মহাবালেশ্বরে পৌঁছুলাম।

স্টেশনে খুব বেশি ভিড় ছিল না, কারণ আমরা যে সময়ে গিয়েছিলাম সে সময়ে ওখানে বেশি টুরিস্ট আসে না। পুজোর সময়েই বেশি ভিড় হয়। বাস স্টেশনটা খুব ছোটখাটো, আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওখানকার 'হলিডে হোমে' গেলাম, সেখানে ছোট কিন্তু সুন্দর একটা কটেজ নিলাম।

তারপরে ওখানকার কেন্টিনে খেয়ে নিয়ে আমরা হলিডে হোমের চারিধারটা দেখতে বেরোলাম। হলিডে হোমটা বিরাট বড়। পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে বেয়ে আমরা একটা বড় প্রাসাদ দেখতে পেলাম। আগে লাটসাহেবের বাড়ি ছিল।

বিকেলের দিকে আমরা এক মাইল দূরে বাজারে গেলাম। 'হলিডে হোম' থেকে সকাল ও সন্ধ্যেবেলা একটা বাস যায়। তখন বাসের সময় নয় বলে আমরা হেঁটেই গেলাম। পাহাড়ী রাস্তায়

হাঁটতে খুব ভালো লাগছিল। বাস স্টেশনের পরেই শুরু হয়েছে বাজার। খুব ছোট বাজার, তবে বেশ বড় বড় দোকান রয়েছে। ফলের মধ্যে বেশির ভাগ রাস্পবেরি-ই দেখা যাচ্ছিল।

ওখানে বেশ ভালো ভালো রেস্তোরাঁ ও হোটেল আছে।

তারপরের দিন সকালবেলা আমরা বাজারে গেলাম। সেখানে গিয়ে খবর পেলাম সাড়ে নটার সময় একটা বাস মহাবালেশ্বরের বিশেষ কয়েকটা জায়গা দেখায়। শুনলাম এখানে নাকি অনেক পয়েন্ট আছে, পয়েন্ট মানে পাহাড়ের ওপরে একটা উঁচু জায়গা।

প্রথমে আমরা গেলাম লাডউইক (Ladwick) পয়েন্ট। অনেক কষ্টের পরে খাড়াই এবং এবড়ো খেবড়ো রাস্তা পেরিয়ে, আমরা ওপরে উঠলাম। সেখানে একটা স্তম্ভ দেখে আমরা কিছু দূরে (Elephant head) হাতীর মাথা বলে একটা পয়েন্টে গেলাম। এরপরে আমরা গেলাম (Wilson) উইলসন নামে আর একটি পয়েন্ট।

এটা সবচেয়ে উঁচু পয়েন্ট ৪৭১০ এখান থেকে নিচে তাকালে রাস্তাগুলো অত্যন্ত ছোট আর আঁকাবাকা লাগে। এরপরে কেটস্ Kates পয়েন্ট দেখে, আমরা গেলাম পুরনো মহাবালেশ্বরে।

প্রথমেই আমরা গেলাম মহাবলীর মন্দিরে, মহাবলীর নামেই এ জায়গার নামকরণ হয় মহাবালেশ্বর। এখানেই কৃষ্ণা, কোয়না ও আরো তিনটি নদীর উৎস, মন্দির প্রাঙ্গণে একটা বরাহের মুখ দিয়ে সারাক্ষণ এই পাঁচটি নদীর মেশানো জল পড়ে।

এখান থেকে আর্থার সীট (Arthur Seat) নামে একটা পয়েন্ট হয়ে, আমরা বাসে করে ফিরে এলাম। সেদিন বিকেলবেলা আমরা বম্বে পয়েন্টে গেলাম, এখান থেকে সূর্যাস্ত খুব সুন্দর দেখা যায়।

পরদিন দুপুরবেলা আমরা বাসে করে প্রতাপগড় দুর্গে গেলাম, এই সেই ইতিহাস বিখ্যাত দুর্ভেদ্য প্রতাপগড়! এখানে শিবাজীর সঙ্গে আফজল খাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। আফজল খাঁ যখন শিবাজীকে আক্রমণ করেন তখন শিবাজী আফজল খাঁকে এই দুর্গের নীচে বাঘনখ দিয়ে হত্যা করেন।

অনেক উঁচুতে উঠে প্রথমে চোখে পড়ল হনুমানজীর মন্দির, আর তার কিছু ওপরে ভবানীর মন্দির। সবার ওপরে একটা সুন্দর উদ্যানের ভেতরে একটা গোল চত্বরের ওপরে শিবাজীর ঘোড়ায় চড়া একটা মূর্তি। তার ওপরে গেলে জুতো খুলতে হয়।

পরদিন সকালে আমরা গেলাম মহাবালেশ্বর থেকে বারো মাইল দূরে পাঁচগানী নামে একটা জায়গায়।

এখানে খুব ভালো ভালো স্কুল আর কনভেন্ট আছে। পুরো শহরটা ঘুরে এবং কয়েকটা পয়েন্ট দেখে আমরা মহাবালেশ্বরে ফিরে এলাম।

সেদিন বিকেলে আমরা ইয়ানা বলে একটা লেকে গেলাম আর বোটে করে সারা লেক ঘুরলাম। ঘোড়ায় চড়লাম; গরম ভুট্টার দানা আর পকৌড়া খেতে খেতে আমরা প্রতাপ সিং পার্কে গেলাম। এটা ভারি সুন্দর, ঠিক ইয়ানা লেকের ওপরে। এখানে নানা রকমের গাছপালা ও ছোটদের খেলার

ব্যবস্থা আছে। তারপরে আমরা হলিডে হোমে ফিরে এলাম।

পরদিন সকাল সাড়ে দশটার সময় আমরা বাসে করে মহাবালেশ্বরকে বিদায় জানিয়ে পুনার দিকে রওনা দিলাম।

## সন্দেশ

অঞ্জন ভট্টাচার্য গ্রাহক নং—২৩৬১, বয়স—১২

নাঃ···আর তো পারা যায় না। ইংরেজী মাসের চার তারিখ হয়ে গেল, তবু-ও সন্দেশ মহাশয়ের শুভাগমন ঘটল না। কি কাণ্ড বল তো। যদিও সন্দেশে লেখা থাকে যে দশ-বারো তারিখ পর্যন্ত সন্দেশ আসার সম্ভাবনা থাকে। তবু-ও···

শেষ পর্যন্ত ঠিক করে ফেললাম, নাঃ, আর নয়। আজ বিকেলে সন্দেশ কার্যালয়ে যাবই। নেপোর বই আর ম্যারাকট্ ডীপ গতমাসে এমন পরিস্থিতিতে শেষ হয়েছে, যে এর পরে কি হল তা ভাবতে ভাবতে রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমোতে ঘুমোতে এক মজার স্বপ্ন দেখলাম।···

আমাদের ঘরটা হয়ে গেছে একটা নদী। আর আমি সেই নদীতে সাঁতার কাটছি। ওপরে তাকিয়ে দেখলাম, ওমা! একি? একটু আগে যেখানে ছাদ ছিল, সেখানে এখন আকাশ। আকাশে পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে আর সুয্যিমামা আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে।

এমন সময় ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি একটা নৌকো আমার দিকে আসছে। নৌকোয় আছে চার ভাই আর এক বোন। দু'ভাই হাল ধরেছে, দু'ভাই দাঁড় বাইছে আর বোন বসে বসে গল্পের বই পড়ছে। নৌকো আরো কাছে এসে পড়ল।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'থামাও, নৌকো থামাও।'

উত্তরে তারা আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসল।

'কি হল? থামাচ্ছ না কেন?'

'উঠেই পড়না,' বড় ভাই উত্তর দিল।

'কি করে উঠব?'

'কেন, লাফিয়ে?'

লাফিয়ে নৌকোয় উঠতে গেলাম। কিন্তু পারলাম না। জলের মধ্যে পড়ে গেলাম। তলিয়ে যেতে লাগলাম গভীরে। সভয়ে চীৎকার করে উঠলাম! আর··

আর? আর ঘুমটা-ও ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি কখন মা বিছানায় আমার পাশে নতুন সন্দেশটা রেখে গেছেন। অবাক হয়ে দেখলাম, সন্দেশের মলাটের সঙ্গে আমার স্বপ্নে দেখা দৃশ্য হুবহু মিলে যাচ্ছে।

## শূন্য গৃহের প্রহরী

অমিতা বসু—গ্রাঃ নং ১৮১৩ বয়স ১২ বছর

মানুষের চলার পথে অনেক বন্ধুই এসে জোটে। কিন্তু সবাই কি সত্যিকারের বন্ধু? না বেশির ভাগই তো সুসময়ের বন্ধু। কদাচিৎ দুই একজন প্রকৃত বন্ধুর সন্ধান মেলে, সুখে, দুঃখে যারা সবসময়েই পাশে থাকে। মানুষের কথা বাদ দিয়ে যদি পশুজগতের দিকে তাকানো যায় তবে মানুষের প্রকৃত বন্ধু হিসাবে সম্ভবতঃ কুকুরের দাবী সবার আগে। অনেক ঘটনা এই সত্য প্রমাণ করেছে। সে ঘটনার, কথা আজ লিখতে বসেছি তাও অনুরূপ একটি সত্য ঘটনা।

মেদিনীপুরের বন্যা মানুষের জীবনযাত্রার উপর যে বিপর্যয় এনে দিয়েছে তা অবর্ণনীয়। অসতর্ক কত মানুষ যে গৃহহারা, কত মানুষ সে বন্যার জলে ভেসে গেছে তার ঠিক নেই। বন্যার হাত থেতে রক্ষা পাবার জন্য অনেক জায়গায় মানুষকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে গাছে, ভেসে যাওয়া ঘরের চালে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাদের আসবাবপত্র, গৃহপালিত পশু বন্যার জলে ভেসে গেছে। উঃ, যারা কোন রকমে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছে তাদের কি দুর্দশা! খাবার নেই, পরণের বস্ত্র নেই এমন কি পানীয় জলের একান্ত অভাব। চারিদিকে জল আর জল কিন্তু পানীয় জল এক ফোঁটাও নেই। ধনী নির্ধনের আজ এক অবস্থা। সবাই সাহায্যপ্রার্থী, 'রিলিফের' জন্য সবাই উন্মুখ।

দুচার দিনে অবশ্য চারিদিক থেকে সাহায্য এসে পড়ল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ছোট বড় অনেক প্রতিষ্ঠান সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। ফলে অনেক পরিবার রক্ষা পেল।

এমনিভাবে রক্ষা পেয়ে গেল ময়নাগ্রামের চন্দ্রশেখর ও তার ছোট পরিবারটি। স্ত্রী তিনটি ছেলেমেয়ে, ও এক বিধবা বুড়ি পিসি, এই নিয়ে ছিল তার সচ্ছল সংসার। পৈতৃক একতলাবাড়ি ও কিছু জমিজমা ছিল, আর ছিল বাড়ি থেকে একটু দূরে একটি মুদিখানা দোকান। গ্রামের মধ্যে ঐ একটিমাত্র ছিল দোকান। তাই তার দোকানটি বেশ ভালোই চলত। তার সংসারে আরেকজন ছিল। সে তার পোষা কুকুর পপি। পপি তার সত্যিকারের বন্ধু ছিল। দিনরাত সে চন্দ্রশেখরের বাড়ি পাহারা দিত। রাত্রে যখন চন্দ্রশেখর সারাদিনের কেনাবেচার পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরত, তখন পপি দেহরক্ষীর মত তার সঙ্গে সঙ্গে আসত।

বেশ চলছিলো। কিন্তু ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী বন্যা হঠাৎ সব ওলটপালট করে দিল। সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কোনক্রমে বাড়ির ছাদে উঠে আশ্রয় নিয়ে সকলে প্রাণ বাঁচাল। পপি সবসময়েই তাদের সঙ্গে ছিল। এই বিপদের উপরে আবার আর এক বিপদ এল। চন্দ্রশেখরের ছোট মেয়েটি ছাদের কিনারা থেকে কিভাবে হঠাৎ এক সময়ে জলে পড়ে ভেসে যাচ্ছিল। পপি দেখতে পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জামাকাপড় ধরল তারপর সাঁতার দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে এল।

এইভাবে দিনচারেক অনাহার, অনিদ্রা ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া কাটানোর পর একদিন রিলিফের নৌকা এসে পৌঁছাল। ঐ নৌকায় তাদের গ্রামের আরও কয়েকজন ছিল। রিলিফের লোকেরা

চন্দ্রশেখরদের নৌকায় তুলে নিল। কিন্তু ঐ নৌকায় পপির স্থান হল না। চন্দ্রশেখর অনেক করে বলল। কিন্তু রিলিফের লোকেরা জানাল যে, যে নৌকা মানুষ উদ্ধারের জন্য সেখানে কুকুরকে কিভাবে নেওয়া যাবে? নিরুপায় চন্দ্রশেখরকে পপিকে ছেড়েই উঠতে হল। নৌকা ছেড়ে দিল। পপি ভেবেছিল তাকেও বুঝি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যখন নৌকা ছেড়ে দিল তখন সে সেইদিকে করুণচোখে তাকিয়ে রইল। চন্দ্রশেখরও তার অনেক দিনের বন্ধু পপির দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না, তার চোখও ঝাপসা হয়ে এল।

এরপর এখানে ওখানে ঘুরে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়া অবশেষে তারা ২৪ পরগণা জেলার কোন একগ্রামে তাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিল। চন্দ্রশেখর কিছু টাকা আনতে পেরেছিল। তার থেকে কিছু দিয়ে সে ঐ গ্রামে একটু জমি কিনে টিনের চালের ছোট একটা বাড়ি তুলল। তারপর তার আত্মীয়ের চেষ্টায় সে ঐ গ্রামে একটা মুদি দোকানও খুলল। এই লাইনে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তাই এটাই ছিল তার সহজতম আয়ের পথ। সে ছিল পরিশ্রমী। পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় দিয়ে সে কিছুদিনের মধ্যে তার অবস্থা বেশ গুছিয়ে ফেলল।

মোটামুটি সব কিছুই হল। কিন্তু তবুও চন্দ্রশেখর মাঝে মাঝে কার কথা ভেবে উদাস হয়ে পড়ে। চোখও তার হয়ে উঠে সজল। তবে সে কি এখনও তার পপির কথা ভোলে নি?

কিন্তু পপির খবর পেতে হলে ফিরে যেতে হবে মেদিনীপুরের সেই পুরনো ময়নাগ্রামে। চন্দ্রশেখররা চলে গেল। পপি বুঝি ভাবল তার প্রভুরা আবার ফিরে আসবে। আবার বাড়ি হয়ে উঠবে সরগরম। আবার সে আগের মতন বাড়ি পাহারা দেবে। কিন্তু যতদিন তার প্রভু ফিরে না আসে—ততদিনও তো তার কাজে অবহেলা করা চলবে না। তাই সে প্রভুর প্রতীক্ষায় বাড়ির সামনে রোয়াকে বসে রইল। ততদিনে আস্তে আস্তে বন্যার জল নামতে শুরু করেছে। চারিধারের বীভৎস দৃশ্য ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। দুর্গন্ধে কোথাও টেকা দায়। এই অবস্থার মধ্যেও পপি তার পুরানো জায়গা থেকে একচুলও নড়ল না। বোধহয় পুরানো দিনের কথা ভেবে তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ত। অনিদ্রায় সে ক্রমশঃ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ল, ক্রমে তার চেতনাও লোপ পেল। তারপর এক সময় কখন সে তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল কেউ তা জানল না। তার মৃতদেহটা ঐভাবেই রোয়াকে পড়ে রইল বুঝি কোনদিন তার ফিরে আসা প্রভুকে এই কথাই বোঝাবার জন্য যে, সে কাজের ভার তাকে দেওয়া হয়েছিল তা সে কেবলমাত্র জীবিতকালেই নয়, মৃত্যুর পরও পালন করে যাচ্ছে।

(প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর চিত্র অবলম্বনে রচিত)।

## গুলের গতি

**সুব্রত ঘটক**

গ্রাহক নং—২০২৮ বয়স—১৩

বিভিন্ন দেশ থেকে তিনজন বন্ধু এসে একটি বন্দরে মিলিত হ'ল। অনেক একথা-সেকথার পর কথা উঠল ট্রেনের গতি সম্বন্ধে। ঠিক হ'ল প্রত্যেকেই তাদের আপন আপন দেশের ট্রেনের গতির একটা

করে নমুনা দেবে। তিন বন্ধুই মিথ্যে কথা বলতে ওস্তাদ। শুরু করল প্রথমজন। বললে—'আমাদের দেশের ট্রেনের গতির নমুনা শুনলে হাঁ হয়ে যাবে। তবে বলি শোন—একদিন আমি ট্রেনে করে এক জায়গায় যাচ্ছি। পথে একটা স্টেশন থেকে ডিম সিদ্ধ কিনলাম। ডিমে একটা কামড় বসিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি পুরো স্টেশনটাই পাল্টে গেছে। এমন কি স্টেশনের নামটাও আলাদা। অনেকক্ষণ চিন্তা করে বুঝলাম যে ডিমে কামড় বসাতে আমার যেটুকু সময় লেগেছে, সেই সময়েই ট্রেনটা পরের স্টেশনে হাজির। তাহলেই বোঝ আমাদের দেশের ট্রেনের স্পীড্ কতখানি।'

প্রথম ব্যক্তি থামল। এবার শুরু করল দ্বিতীয় ব্যক্তি। বলল—'একদিনে আমি বুয়েন্স এয়ার্স থেকে ভ্যালপারাইজো যাচ্ছি। ষ্টেশনে ছোট ভাইকে আদর করছি। হঠাৎ দেখি আমার হাতটা একটা লোকের গালে গিয়ে লাগল। ষ্টেশনের নামটা দেখলাম আলাদা। বুঝলাম বুয়েনস এয়ার্সে যে হাত দিয়ে ভাইকে আদর করছিলাম সে হাতটা সরাবার আগেই ট্রেনটি পরের ষ্টেশনে পৌঁছে গেছে। ফলে হতভাগ্য লোকটিকে লাভ করতে হ'ল একটি দারুণ চপেটাঘাত।'

তৃতীয় ব্যক্তি এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। এবার তার পালা। গম্ভীর গলায় সে বলল, একদিন আমি লাইনের ধারে বসে আছি। এমন সময় একটা কি যেন লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে গেল। প্রথমটা বুঝতে পারিনি। মিনিট পনেরো পরে দেখি একটা ট্রেনের ছায়া কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। ট্রেনটির গতি এত বেশি যে তার সঙ্গে তাল রাখা তার ছায়াটির পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই সে পিছিয়ে পড়েছিল।

## বড় হয়ে কি হব

**সুপ্রতীক বাগচী** গ্রাঃ নং ৮৩৮—বয়স ১২½

সকলে শুধায় যবে—
'বড় হয়ে কিবা হবে ?'
বলিতে পারি না ঠিক কিছু।
মাথাটি করিয়া থাকি নিচু।
যাই যবে নদী তীরে,
নৌকা কত দেখি নীরে,
মনে হয় মাঝি যদি হই
সারাদিন তরী পার বাই।
যবে দেখি রেলগাড়ি
চলিতেছে ধোঁয়া ছাড়ি—
চালক হইতে সাধ মনে,
যাই চলে সুদূরের বনে।
কখনো বা দেখি জেলে,
মাছ ধরে জাল ফেলে—
জল, ঝড়, রৌদ্রে প্রখর,
ইচ্ছা হয় হইতে ধীবর।
যোগী যবে শান্ত মনে
করে জপ তপোবনে
মনে ভাবি সাধুবেশ ধরে
যাব সংসার ত্যাগ করে।

## 'বন্দী টিয়া'

**মিতা মুখোপাধ্যায়**—বয়স ১৩, গ্রাহক সংখ্যা ২০৩০

লোহার খাঁচায় বন্দী টিয়া ভাবে,
এমন সুদিন হবে তাহার কবে ?
নীল আকাশে সবুজ ডানা মেলে'
উড়ে যাবে সকল বাধা ঠেলে।
ছোট্ট টিয়া ভবে আপন মনে,
ফিরবে কবে চির সবুজ বনে,
যেথায় তাহার মা ও বাবা আছে,
আরও আছে সবুজ গাছে গাছে।
সেইখানেতে সবার সাথে মেলা
ছোট টিয়া করবে অনেক খেলা।

## সে এক সামান্য কর্মী

**বাসব চট্টোপাধ্যায়** গ্রাঃ নং ১৯০৭—বয়স ১৩

পাঁচীলের ওপর আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ডেঁয়োরাজ্যের এক সামান্য শ্রমিক। ঘুরে বেড়াচ্ছিল বললে ঠিক বলা হবে না—একে ঠিক পাহারা দেওয়াও বলা চলে না—চিন্তা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে যেন কি পর্যবেক্ষণ করছিল। মনে তার ভীষণ আশঙ্কা, আকাশে বাতাসে তার রাজ্যের কি যেন এক অমঙ্গল ঘোষিত হচ্ছে। তার মনে তাই আর সুখ নেই।

কিন্তু হঠাৎ—একি ? কোথায় যেন গুরু গুরু শোনা গেল না ? টুকুদের উঠোনের যেখানটায় সূর্য না ডোবা পর্যন্ত রোদে ফেটে যেতে থাকে সেখানে যেন কিসের কালো ছায়া পড়েছে। ঈশান কোনটি কালোয় কালো বইতে শুরু করেছে ঠাণ্ডা বাতাস তাতে আবার বৃষ্টির গন্ধ মাখা। ঠাণ্ডা বাতাসে অবশ্য শরীর জুড়িয়ে গেল। কিন্তু তার তো বুক ভরে নিশ্বাসটুকু নেবার সময়ও যে নেই। দৌড়ে ফিরে চলল সে তার গর্তে। সামলাতে হবে তার বিশাল রাজ্য আসন্ন কালবোশেখীর করাল কবল থেকে। রাজ্যটি বিশাল কিন্তু অলস রাজা—নিষ্কর্মা রাণী—শুধুমাত্র ডিম পাড়া ছাড়া অন্য কোন কাজ পারে না, জানে না। শত শত অসহায় বাচ্চা, পুতলী, অজস্র ডিম, সঞ্চিত খাদ্য—আর হাজার হাজার বীর কর্মী কর্তব্যনিষ্ঠ পিঁপড়ে ভাই।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল রাজ্যে। মুহূর্তে সমস্ত রাজ্যের সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে চলল ডিম মুখে কর্মীরা। ক্ষুদে ক্ষুদে ছটি পায় তাদের অসীম ব্যস্ততা—বৃষ্টি নামার আগেই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে হবে যেখানে বিন্দুমাত্রও জল ঢোকে না।

হৈ হৈ করে এসে পড়ল ঝড়, শিলা বৃষ্টি হতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মীরা সমস্ত রাজ্যটি মাথায় করে নিরাপদে ভাঁড়ার ঘরের ফাটলে ঢুকে পড়েছে। এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সেই সামান্য অসামান্য কর্মীটি।

# ধাঁধা

১

**দেবাশীষ রক্ষিত**

গ্রাহক নং ১৭০৫—বয়স ১১ বছর ৫ মাস

চার অক্ষরে এমন একটি বৈজ্ঞানিকের নাম কর যার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষর নিয়ে একটি জন্তুর নাম হয়। আবার তৃতীয় ও চতুর্থ অক্ষর নিয়ে একটা ওজন হয়।

২

উত্তমকুমার বটব্যাল—গ্রাঃ সং ১৪৮১—বয়স ১২ বছর

কাঁটা ভরা সারা গা, নয় তবু তরু।
পেটখানা কাটো যদি হয়ে যায় সরু।

# ধাঁধার উত্তর

১

বাণী সরকার

গ্রাহক সংখ্যা ২১৭৫—বয়স ১১ বছর

জানালা।

২

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

গ্রাহক সংখ্যা—২০৮৪, বয়স ১৫ বছর

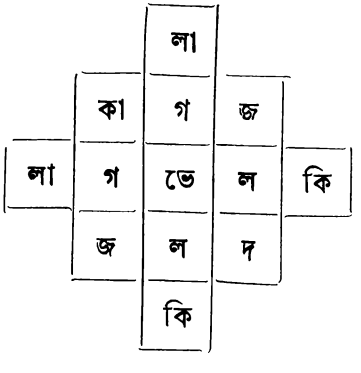


৩

শুভাশীষ ধর

গ্রাহক সংখ্যা ২২০২—বয়স ১১½ বছর

পাতাল।

( উত্তর দেবার শেষ দিন ২০শে ডিসেম্বর )

(১)

খোকা আর রাজা চুপি চুপি কপিলা নদীর ধারে শালবনে বেড়াতে চলল। ওরা ঠিক করল যে সময় না হলে, যদি বা জঙ্গল পর্যন্ত যায়, নদী পার হয়ে ওপারে যাবে না।

খোকা কম সাহসী না, তবে খুব কষ্টসহিষ্ণু নয় সে, সহজেই হাঁপায়। রাজা কিন্তু বেদম ডানপিটে, পাঁচীল ডিঙোন, গাছে চড়া ইত্যাদি কাজে রীতিমত ওস্তাদ! তাছাড়া, হাঁ, সত্যিই সে খুব সাহসী।

নদীর ধারে কেবলই পাথর, কালো কালো, আর খোঁচা-খোঁচা, তকতকে সাদা বালি আর, তারপর টলটলে পরিষ্কার জল। জলে আবার কত মাছ। রাঙা হয়ে আছে সমস্ত বন পলাশ, চাঁপা, পিয়াল, শাল আর অশোক ফুলে।

( উপরের গল্পটার মধ্যে কি কি পাখির নাম লুকোন আছে বার কর ত। )

(২)

কলেজের ছেলেদের বড় একটা দল, মস্ত বাস রিজার্ভ করে চলেছে বনভোজন করতে।

কলকাতা ছেড়ে কয়েক মাইল যাবার পরে দেখা গেল যে রাস্তাটা একটা রেললাইনের তলা দিয়ে গেছে। অবশ্য এই রাস্তা দিয়ে সাধারণ গাড়ি-ঘোড়া আর ছোট ছোট বাস হরদম চলাচল করে। কিন্তু, এত বড় বাসটা রেল ব্রিজের তলা দিয়ে পার হতে পারবে কি? সন্দেহ!

ছেলেরা তাড়াতাড়ি গজ-ফিতে নিয়ে বাসের উচ্চতা আর রেলব্রিজের তলাকার উচ্চতা মেপে দেখে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, বেরিয়ে যাবে কোন মতে!

ড্রাইভার তাদের নির্দেশ মতন বাস চালিয়ে দিল, কিন্তু, হায় হায়! মাঝপথে গিয়ে খুব সামান্য একটুর জন্য পার হওয়া গেল না, বাসের ছাদটা ব্রিজের তলায় এমনই আটকে গেল যে বাসটা না পারে এগোতে আবার না পারে পেছোতে!

দেখতে দেখতে সামনের গ্রাম থেকে, রাস্তা থেকে, রাস্তার ধারের পেট্রল পাম্প আর দোকান থেকে বহু লোক এসে জড় হল আর নানারকম উপদেশ-নির্দেশ দিতে লাগল!

কেউ বলল—বাসের ছাদটা কেটে ফেল।

কেউ বা বলল—শাবল গাঁইতি দিয়ে ব্রিজের তলাটা কিছুটা না ভেঙ্গে ফেললে বাস বার করবার উপায় নাই।

কিন্তু, এসব করতে যে শুধু অনেক খরচ আর সময় লাগবে তাই নয়, বিনা অনুমতিতে বাস বা ব্রিজ কিছুই ভাঙ্গা চলবে না! ছেলেরা বাস থেকে নেমে কত ঠেলাঠেলি করল, কিন্তু বাস তেমনি অনড়!

হঠাৎ ছেলেদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন চমৎকার একটা বুদ্ধি দিল আর সেই অনুসারে কাজ করবার ফলে বাসের ছাদ বা ব্রিজের তলা কিছুই না ভেঙ্গে, বিনা খরচে আর অল্প সময়ের মধ্যে ব্রিজের তলা দিয়ে বাসটাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল আর ছেলেরা আবার তাদের গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলল।

বল ত ছেলেটি কি বুদ্ধি দিয়েছিল?

(৩)

বসুমহাশয়, তাঁর স্ত্রী, ছেলে, বোন ও শ্বশুরকে সকলেই শ্রদ্ধা করে কারণ এঁদের মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত অধ্যাপক, একজন নামকরা গাইয়ে, একজন নিপুণ চিত্রকর, একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং অপরজন সুদক্ষ চিকিৎসক।

এঁরা কে যে কি তা অবশ্য আমি সঠিক জানি না, কেবল এইটুকু জানি যে—

(ক) অধ্যাপক ও গাইয়ের মধ্যে কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই।

(খ) চিত্রকর মহিলাটি অন্য মহিলার চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু অধ্যাপকের চেয়ে ছোট।

(গ) সাহিত্যিক তাঁর কলেজ জীবনে বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন, তিনি ডাক্তারের চেয়ে বয়সে বড়।

বল ত কার কি পেশা?

## কার্ত্তিক মাসের ধাঁধার উত্তর :—

( উত্তরদাতাদের নাম আগামী মাসে প্রকাশিত হবে। )

(১) ন।  (২) বৈঠকখানা।

(৩) (ক) ১। প্রথমে লাল বাটির থেকে একটা বল নাও। বলটা যদি নীল হয় ২। আবার

লাল বাটির বল নাও। এবার যদি বলটা লাল হয় তাহলে ৩। আবার লাল বাটির বল নিলেই তিন দানের মধ্যে তিনটে বল পেয়ে যাবে।

(খ) ১। লালবার্টির প্রথম বলটা নীল আর ২। দ্বিতীয় বলটা সবুজ হলে ৩। সবুজ বাটির বল নাও, সেটা লাল হলে আবার তিনদানের মধ্যে তিন রঙ পেলে।

(গ) ১। লালবাটির প্রথম বলটা নীল আর ২। দ্বিতীয় বলটী সবুজ হলে এবং ৩। সবুজ বাটির প্রথম বলটাও নীল হলে ৪। আবার সবুজ বাটি থেকে তুললেই লাল বল পাবে।

(ঘ) ১। লালবাটির প্রথম বলটা লাল হলে সেই বাটিতেই আবার নেবে, ২। সেটা সবুজ হলে ৩। তৃতীয়টা নীল হবেই।

(ঙ) ১। লালবাটির প্রথম বলটা সবুজ হলে, ২। সবুজ বাটির বল নেবে, সেটা নীল হলে আবার ৩। সবুজ বাটির নেবে সেটা লাল হবেই।

(চ) ১। লাল বাটির প্রথম বলটা সবুজ হলে এবং ২। সবুজ বাটির বল নেবে, সেটা লাল হলে ৩। আবার সবুজ বাটির বল নেবে, সেটাও লাল হলে ৪। আবার নিলে নীল হবেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কোন অবস্থাতেই চারদানের বেশি লাগছে না।

---

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

* বহুসংখ্যক গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা ডাকে হারিয়েছে জেনে আমরা খুবই দুঃখিত।

* যদি কিছু সংখ্যা অতিরিক্ত থাকে তাহলে চৈত্রমাসে তাদের আর এক কপি করে দিতে চেষ্টা করব।

* কিন্তু সেগুলি সাধারণ ডাকে পাঠান হবে না। হাতে নেওয়া যাবে বা ডাকখরচ ১৲ দিলে রেজিঃ ডাকে যাবে।

# বিজ্ঞান প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার ফলাফল

অমিতানন্দ দাশ

পূজো সংখ্যার এই প্রতিযোগিতায় কেউ কেউ তো দিস্তা দিস্তা উত্তর পাঠিয়েছো। তবে কেউই সম্পূর্ণ সঠিক উত্তর দিতে পারো নি। প্রতিযোগিতার ফলাফল :—

প্রথম (৮টি ঠিক এবং একটি প্রায় ঠিক উত্তর ) : ২৭৭৯ অঞ্জন সরকার ( বয়স ১১ )

১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার।

দ্বিতীয় ( ৭টি ঠিক এবং একটি প্রায় ঠিক উত্তর ) : ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত।

তৃতীয় ( ৭টি ঠিক উত্তর ) : ৩২১ অজন্তা ঘোষ ( বয়স-১২ )

৮৯৪ তপন ঘোষ।

এছাড়া প্রত্যেক প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো উত্তরও নীচে ছাপা হলো। অবশ্য সকলের বোঝার সুবিধার জন্য অনেক জায়গায় ভাষাটা একটু পরিবর্তন করা হয়েছে।

(১) দিনের বেলায় চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে কি ?

এই প্রশ্নের একমাত্র সঠিক উত্তর দিয়েছো অজন্তা ঘোষ। বলতে কি প্রশ্নটা একটু ঠকানো ধরনের—চট করে যে উত্তরটা মনে আসে সেটা এতোই সহজ যে প্রশ্নে যে আরেকটা প্যাঁচ আছে সেটা সহজে খেয়াল হয় না।

উত্তর ( অজন্তা ঘোষ )—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতিসরণের জন্য সাধারণ হিসাবে যখন সূর্য অস্ত যাবার কথা তার কিছুক্ষণ বাদে সূর্য ডোবে। সেই রকমেই প্রতিসরণের জন্য চাঁদ সাধারণ হিসাবে যখন উঠবার কথা তার কিছুক্ষণ আগেই চাঁদকে দেখা যায়। কাজেই সূর্য ডুববার ঠিক আগের মুহূর্তে যদি চাঁদ ওঠে এবং ঠিক তখনই চন্দ্রগ্রহণ হয় তাহলে দিনের বেলায় চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

(২) রকেটের ডানা থাকে না কেন ? ( সবচেয়ে ভালো উত্তর : অঞ্জন সরকার )

উত্তর—রকেটে জ্বালানীর দহনের ফলে প্রচণ্ড চাপযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী সেই চাপের প্রতিক্রিয়া বলের সাহায্যেই বোমযানটি মহাশূন্যে ধাবমান হয়। সেখানে কোনো বায়ু নেই বলে ডানা, প্রপেলার ও জেট এঞ্জিন কার্যকরী হয় না। তাই রকেটে ডানা থাকে না।

(৩) বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়ে কি করে ?

তোমাদের অনেকেরই দেখলাম শিল পড়া এবং বরফ পড়ার মধ্যে পার্থক্যটা জানা নেই—নিশ্চয়ই বরফ পড়া কখনো দেখোনি বলে ! আকাশ থেকে পড়া বরফের কণাগুলি খুব ছোট ছোট হয়, আলাদা

করে একটি কণাকে চোখে তো প্রায় দেখাই যায় না—এক একটা বৃষ্টির (বরং ইল্‌শেগুঁড়ির) ফোঁটা জমে গেলে যা হয় তাই আর কি। শিল হচ্ছে একটা জমাট বরফের চাঁই, ইংরেজীতে যাকে বলে ice আর আকাশ থেকে যে বরফ পড়ে তা হলো snow—এর মধ্যে অনেক হাওয়া, ফাঁক থাকে। মানে ice যদি বেলে পাথর হয় তবে snow হলো বালি আর কি। আবার মজা কি জানো, ঠাণ্ডা দেশে যেখানে বরফ পড়ে সে দেশে কিন্তু শিলাবৃষ্টি হয় না বললেই চলে। কারণ কালবৈশাখী জাতীয় ঝড় হলে তবেই শিলাবৃষ্টি হয়, এবং এরকম ঝড় গরমের দেশেই বেশী হয়।

উত্তর ( তপন ঘোষ )—বৃষ্টির সময়ে কখনো কখনো প্রবল উর্ধ্বমুখী বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়। তখন মেঘস্থ নিম্নমুখী বৃষ্টির জলকণাগুলি ইহার প্রভাবে আবার উপরে উঠিয়া যায়। এইভাবে ক্রমশঃ জলকণা গুলি শীতল থেকে শীতলতর স্তরে প্রবেশ করে এবং তাহাদের তাপমাত্রা যখন—২০° সেন্টিগ্রেড হয় তখন তারা জমিয়া যায়। পার্শ্ববর্তী জলকণাগুলিও এদের উপর এসে জমা হলে এগুলি আয়তনে দ্রুত বাড়িতে থাকে। তখন আর উর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহ ইহাদের ধরিয়া রাখিতে পারে না, একটি গোলাকার বরফের পিণ্ডের মতো হয়ে এগুলি পৃথিবীর আকর্ষণে নীচে নামিতে শুরু করে। এইভাবে বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়ে।

(৪) পাখী ডিমে তা দেয় কেন ?

উত্তর ( সুতপা বিশ্বাস, ২৬৩১ )—ডিম একটি বিশেষ তাপমাত্রায় বিকশিত হয় এবং পূর্ণ বিকাশের পরই তাহা হইতে শাবক বাহির হয়। মানুষের শরীরের মধ্যে শিশু শরীরের তাপমাত্রাতেই পূর্ণ বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায়। কিন্তু পাখীর ডিম আগেই শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে বলিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্য পাখী তাহাতে তা দেয়।

(৫) আমরা কিছুটা দূর থেকে কোনো জিনিসের গন্ধ পাই কি করে ?

উত্তর ( অজন্তা ঘোষ )—যখন কোনো গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য কিছু দূরে থাকে তখন সেটা থেকে নিষ্কৃত গন্ধকণা বাতাসের সঙ্গে মিশে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যখন সেই গন্ধকণা আমাদের নাসারন্ধে প্রবেশ করে ও ঘ্রাণ স্নায়ুতে আঘাত করে তখন মস্তিষ্কে সেই দ্রব্যের গন্ধের অনুভূতি জন্মায়। এর ফলে গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যটি কিছুদূরে থাকতেই আমরা তার গন্ধ পাই।

(৬) টিউবওয়েলে যে জল ওঠে তা মাটির নীচে কিভাবে থাকে ?

উত্তর ( নন্দিনী দত্ত মজুমদার )—একটা ভেজা তুলোর মধ্যে জল যে অবস্থায় থাকে মাটির নীচে বালু বা মাটির মধ্যেও জল সেইভাবে মিশে থাকে। যখন কোনও যায়গায় টিউবওয়েল বসানো হয় তখন সে জল টিউবওয়েলের নলের মধ্যে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমা হতে থাকে। একটা জায়গার উচ্চতা, বৃষ্টিপাত ও মাটির ধরণ বুঝে একটা নির্দিষ্ট গভীরতা পর্য্যন্ত এই জল নল ভর্তি করে থাকে। এর পর টিউবওয়েল পাম্প করার ফলে সেই জল উপরে উঠে আসে। নল খালি হলে জল আবার ক্রমশঃ তাকে ভর্তি করে ফেলে।

(৭) একটি থার্মোমিটার যদি রোদে থাকে, আর আরেকটি থাকে ইঁটের ঘরে—তবে এগুলি যে তাপমাত্রা দেখাবে তা কি খবরের কাগজে দেওয়া দৈনিক তাপমাত্রার সমান হবে? না হলে কি হবে? কেন?

উত্তর ( তপতী দাশগুপ্ত )—যে থার্মোমিটার রোদে আছে তার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আসল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থেকে বেশী হবে, কিন্তু সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আসল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সমান হয়ে। কারণ দৈনিক কাগজে যে তাপমাত্রা দেওয়া থাকে তা ছায়ায় উন্মুক্ত বায়ুর তাপমাত্রা। কিন্তু শুধুমাত্র রোদে থাকাকালীন সময়েই দুই তাপমাত্রার তফাৎ হবে, কাজেই রোদের তেজ কম হলে বা মেঘ হলে রোদে থাকা থার্মোমিটারের তাপমাত্রা প্রায় হাওয়া আপিসের থার্মোমিটারের তাপমাত্রার সমানই হবে।

আর যে থার্মোমিটার ঘরে থাকছে তার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আসলের থেকে কম আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আসলের থেকে বেশী হবে। কারণ ইঁটের ঘরের আপেক্ষিক তাপ বেশী বলে এর তাপ বাড়তে বা কমতে সময় লাগে, আর সেই জন্যই দিনের বেলায় ইঁটের ঘরের বায়ুর তাপমাত্রা ঘরের বাইরের ছায়ার তাপমাত্রার চেয়ে কম, কিন্তু আবার রাত্রে ঘরের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রার চেয়ে বেশী।

(৮) মোমবাতির শিখায় কোনো জিনিস ধরলে তাতে কালি পড়ে কেন?

উত্তর ( তপতী দাশগুপ্ত )—মোমবাতি অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বনের একটি যৌগিক পদার্থ। যখন মোমবাতি জ্বলে তখন মোমবাতির কার্বনের একাংশ পুড়ে যায় ও অবশিষ্ট কার্বন ছোট ছোট কণা আকারে হাওয়ায় ভেসে ওঠে। কোনো বস্তু মোমবাতির শিখায় ধরলে এই কার্বন কালিরূপে তাতে জমা হয়।

(৯) টিউবলাইটের আলোতে কোনো জিনিস নড়লে তাকে কি রকম দেখায়? কেন?

অনেকেই বোধ হয় টিউবলাইটের আলোতে কোনো জিনিস নড়লে যে সাধারণ বাল্বের আলোয় নড়ার থেকে অন্যরকম দেখায় তাই খেয়াল কর নি। মূল কথা হচ্ছে যে বাল্ব এবং টিউবলাইটের কর্ম-প্রণালীই আলাদা—বাল্ব গরম হয় কিন্তু টিউবলাইট গরম হয় না। বাল্ব নিবোবার সময় দেখেছো নিশ্চয়ই সুইচ অফ করার প্রায় এক সেকেণ্ড বাদে পুরো অন্ধকার হয়, এর কারণ হচ্ছে যে বাল্বের তার গরম হবার ফলেই আলো দেয় আর যখন কারেণ্ট নেই তখনও তারটি ঠাণ্ডা হতে কিছুক্ষণ সময় নেয়। কাজেই যখন একটি বাল্ব এ সি সাপ্লাই ভোল্টেজে চলে তখন যদিও মাঝে মাঝে বাল্বের মধ্যে দিয়ে কোনোই কারেণ্ট থাকে না তবুও তারটি গরম থাকার ফলে আমরা বেশ কিছুটা আলো পাই। কিন্তু টিউবলাইট দেখেছো নিশ্চয়ই সুইচ অফ করলে চট করে নিবে যায়, বাল্বের মতো আস্তে আস্তে নয়। এর কারণ টিউবলাইটের ভিতরকার পারার বাষ্প আলো দেয় গরম হয়ে নয়, কারেণ্ট যাবার ফলে একটি জটিল ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়া ঘটার ফলে।

উত্তর ( নন্দিনী দত্ত মজুমদার )—এ সি সাপ্লাই ভোল্টেজ ক্রমাগত বাড়ে কমে—সর্বাধিক, তারপর শূন্য, তারপর আবার সর্বাধিক ঋণাত্বক ভোল্টেজ পাওয়া যায়। টিউবলাইট সবচেয়ে বেশী আলো দেয়

যখন সর্বাধিক ভোল্টেজ থাকে তখন, আর যখন শূন্যতে থাকে তখন কোনো আলো দেয় না। সাধারণ ভারতীয় এ সি ভোল্টেজের স্পন্দন সংখ্যা পঞ্চাশ বা ভোল্টেজ সেকেণ্ডে প্রায় পঞ্চাশবার এরকম ওঠা-নামা করে। এর ফলে টিউবলাইটের সামনে একটা আঙুল জোরে নাড়লে কারেণ্ট যখন শূন্য থাকে তখন আঙুল দেখা যায় না। যখন ভোল্টেজ সর্বাধিক থাকে তখন আঙুলকে খুব উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। এই জন্য একটি আঙুলকেই মনে হয় অনেকগুলি আঙুল।

(১০) ইলেকট্রিক কলিং বেল বাজলে তার কাছে কোনো রেডিও থাকলে তাতে আওয়াজ হয় কেন?

উত্তর ( নন্দিনী দত্ত মজুমদার )—যদি রেডিও এবং বেল একই সার্কিটে থাকে তাহলে বেল বাজলে রেডিওর সাপ্লাই ভোল্টেজ ওঠানামা করবে যার ফলে রেডিওতে ঘর ঘর শব্দ হবে। এছাড়াও কলিং বেল বাজালে স্পার্কের ফলে কতকগুলি রেডিও তরঙ্গের সৃষ্টি হয় যা কাছাকাছি কোনো রেডিও থাকলে তার এরিয়ালে ধরা পড়ে গোলমালের সৃষ্টি করে। মেইন্‌স্ ( ২২০ ভোল্ট ) রেডিও হলে এবং মেইন্‌স্ থেকে চালিত ইলেকট্রিক বেল বাজলে এই দুই ভাবেই রেডিওতে শব্দ হয়। কিন্তু যদি রেডিও ও বেল আলাদা সার্কিটে থাকে—যথা রেডিওটি ট্রানজিস্টার সেট হলে বা বেলটি ব্যাটারীচালিত হলে—শুধু দ্বিতীয় ভাবে শব্দ হবে। তখন রেডিওতে শব্দ হবে, কিন্তু কম।


সহস্রাধিক স্কুলের পাঠ্য তালিকাভুক্ত

**Common Words**

*A Simple English-Bengali Dictionary for Boys & Girls*

বিদ্যালয়ে সকল স্তরে পঠিত ইংরেজী পুস্তক ও কিশোর বয়স্কদের জন্য লিখিত বহু ইংরেজী জীবনী ও আখ্যায়িকা হইতে নির্বাচিত ছয় হাজার শব্দের সচিত্র অভিধান।

● প্রতিটি ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ বাংলা অক্ষরে পাশে পাশে লিখিত ● প্রতিটি শব্দের 'সিলেব্‌ল' ভাগ করা ● অর্থবোধ সুস্পষ্ট করার জন্য অসংখ্য রেখাচিত্র সম্বলিত ● লাইনোটাইপে ঝরঝরে ছাপা

: কয়েকটি অভিমত :

"ইহার তুল্য এই ধরণের বই আছে বলিয়া আমার জানা নাই"—
ডঃ অমলেন্দু বসু [ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ]

"ইংরেজী শব্দ সাগরে নিক্ষিপ্ত বাঙালী সন্তানদের কাছে এই অভিধানটি এক কথায় লাইফ বোট।"—
শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু [ অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ]

"এত সস্তা দামে এমন সুন্দর অভিধান আজকাল কল্পনাও করা যায় না।—
শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী ( [ টেকস্ট্ বুক কমিটির ভূতপূর্ব সেক্রেটারী ]

মূল্য : ২·০০

[ জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত ]

**জেনারেল বুকস্, এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২**

(১) দোলন চাঁপা চৌধুরী, ৮৯৮, বয়স ?

তোমার কার্ড পেয়ে খুব ভালো লাগল। তুমিও আমাদের স্নেহাশীর্বাদ নিও।

(২) মিত্রা রায়চৌধুরী, ১৪২৫, বয়স ১০

নিজের হাতে আঁকা ছবি পাঠিয়েছ, তার মতো কি আর কোনো উপহার হয়? তোমাকে স্নেহাশীর্বাদ জানাচ্ছি।

(৩) অনীতা চট্টোপাধ্যায়, ২২৩৯, বয়স ১৩

ভাই, লেখা ভালো হলেই আমরা ছাপাই। তবে, অনেক সময় স্থানাভাবে একটু দেরি হয়। লিখলেই ছাপা হবে, এটা কিন্তু আশা করা উচিত নয়। মর্মাহত কেন হবে? লেখা ছেড়ো না। লিখতে লিখতে দেখবে কত ভালো লেখা কলম থেকে বেরুচ্ছে। যে বিভাগে চিঠি লিখবে, নাম ঠিকানার উপরে এক কোণে সেই বিভাগের নাম লিখে দিও, যথা প্রকৃতি পড়ুয়া, বা হাত-পাকাবার আসর ইত্যাদি।

(৪) অভিজিৎ চৌধুরী, ১৯০২, বয়স ১২

ভারত ও পাকিস্তান ছাড়া তো অনেক জায়গা থেকে বাংলায় খবর বলা হয়, যেমন ভয়স অফ অ্যামেরিকা, বি-বি সি ইত্যাদি। সন্দেশের যে সব গ্রাহকের বয়স ১৭র বেশি নয়, তাদের লেখা একটু ভালো হলেই, হাতপাকাবার আসরে ছাপা হয়। বাইরের লোকের লেখা খুব ভালো হলে আমরা সর্বদা ছাপি। বেশির ভাগ নাম করা লেখক-ই তো বুড়োর দলে অর্থাৎ ১৭র বেশি বয়স, ক'জনই বা গ্রাহক।

(৫) অপরাজিতা বসু, ১৮১৩, বয়স ১৩

কলকাতায় পুজো কাটানোর তো একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। এ বছর কয়েকজন বিদেশী ভ্রমণকারীর এরোপ্লেন রেজার্ভেশনে কি যেন গোলমাল হওয়াতে, তাঁরা পুজোটা কলকাতায় কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। দেখে তো তাঁরা একেবারে মুগ্ধ। লঞ্চে করে মাঝগঙ্গা থেকে বিজয়া দশমীর দিন ভাসান দেখে তাঁদের মুখে আর কথা সরে না। এ জিনিস যে কোথাও আজকালকার দিনেও হতে পারে, এটা তাঁদের কল্পনার বাইরে ছিল। বাস্তবিক কলকাতার পুজো একটা দেখবার জিনিস। আশা করি তুমিও সে-সব উপভোগ করেছ।

তুমি একদিন ভারতের গৌরব হয়ে বিশ্ববাসীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাও, সে খুব ভালো

কথা। কিন্তু তার আগে ভারতের সেবিকা হয়ে, নিজের দেশের লোকের কাছে এগিয়ে এসো, এই আশীর্বাদ করি।

পূজা সংখ্যা ভালো লেগেছে শুনে খুসি হলাম।

(৬) অলকানন্দা চট্টোপাধ্যায়, ১৪৫৮, বয়স ১৪

তুমিও আমাদের স্নেহাশীর্বাদ নিও। তোমার আগের কোনো চিঠির উত্তর পাওনি বলে আমরা সত্যি দুঃখিত। তবে সব চিঠি উত্তর দেবার জায়গা বা সময় থাকে না, এটা তো বোঝ, কাজেই কিছু বাদ পড়ে। তোমাদের সম্পাদক মহাশয়ই যে চিত্র পরিচালক সে বিষয়ে কি তোমার মনে কোনো সংশয় আছে নাকি? তিনি আর নিজে কি করে, 'আমি-ই সে, আমি-ই সে' বলেন বল? তবে ফিল্ম তৈরি সম্পর্কে অনেকবার সন্দেশে লিখেছেন, তাই থেকেই নিশ্চয়-ই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ।

(৭) নন্দিতা সুমন্ত্র ও সুমিত, সেনগুপ্ত, ২৩৭৯, বয়স ১২, ১১, ৭

এতদিনে নিশ্চয় গ্রাহক কার্ডটি পেয়েছ? অনেকদিন হল পাঠানো হয়েছে। সবাইকেই গ্রাহক কার্ড দেওয়া হয়। যত্ন করে রেখো। পত্রবন্ধুকে চিঠি লিখতে হলে, আমাদের আপিসের ঠিকানায় লিখো, আমরা পাঠিয়ে দেব। কোণায় লিখো পত্র-বন্ধু, আর যাকে লিখছ তার নাম ও গ্রাহক সংখ্যা দিও।

(৮) পার্থসারথি বসু, ২৭৮০ (এই হল তোমার গ্রাহক সংখ্যা) বয়স ৯,

নিজের নাম বানান ভালো করে শিখে রেখো, ভাই। গ্রাহক—কার্ড তো পাঠানো হয়েছে, এখনো পাওনি নাকি? তা হলে আমাদের আপিসে শ্রীমতী নলিনী দাশকে জানিও।

(৯) শীলা সাহা ২৭২৬, বয়স ১৬

এতদিনে গ্রাহক কার্ড নিশ্চয় পেয়ে গেছ। পত্রবন্ধু চাই—শখ:—বই পড়া, সাইকেল চড়া, সেলাই।

(১০) শর্মিলা বিশ্বাস, ১৮৭৮,

বয়স দাওনি কেন? এত দিনে নিশ্চয় কার্ড পেয়েছ?

(১১) প্রবীরকুমার সিংহ, ২৫৬৭, বয়স ১০

গ্রাহক কার্ড পেয়েছ তো? গুপী গাইনের গল্প অনেক বছর আগে ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখেছিলেন। সেই গল্প একটু বদলিয়ে তাঁর নাতি সত্যজিৎ ফিল্ম করেছেন।

(১২) মণিশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, ২৩৪৮, বয়স ১৩

লিখবেই যখন, তখন এখন থেকেই বানান সম্বন্ধে সাবধান হও, কেমন? কার্ড পেয়েছ আশা করি।

(১৩) সুপর্ণ চৌধুরী, ১২০৯, বয়স ১১

এর পরেরবার নিজের হাতে চিঠি লিখো, কেমন?

(১৪) অমিত বাগচি, ২৬৭৪, বয়স ১৫½

তুমিও আমাদের স্নেহাশীর্বাদ জেনো। পূজা সংখ্যা ভালো লেগেছে বলে খুশি হলাম।

(১৫) হিমাদ্রি চৌধুরী, ৮৯৮, বয়স ১৪

তোমার চিঠি পেয়ে ভালো লাগল। মাঝে মাঝে আজকাল মনে একটু সন্দেহ জাগে যে পূজার বাইরের এত আড়ম্বরের মধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধার জন্য যথেষ্ট জায়গা বাকি থাকে কি? তোমার চিঠি পড়ে মনে হল তাও থাকে বৈ-কি। তোমাদের সম্পাদক মহাশয়ের ফিল্ম তোমার ভালো লেগেছে খুব-ই ভালো কথা। বাদশাহী আংটির-ও ফিল্ম হবার কথা শোনা যাচ্ছে। ব্রানটালুসির গল্প কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে বেরুচ্ছে লক্ষ্য করেছ বোধ হয়? পূজা সংখ্যায় বড়ই স্থানাভাব হয়েছিল।

(১৬) তপতী দাসগুপ্তা, ২৮১৬

কার্ড পেয়ে খুসি হলাম। দেখি শিবানী রায়চৌধুরীকে চিঠি লিখে, যদি সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা লিখে পাঠান।

(১৭) ধ্যানচাঁদ বৈদ্য, ২৪৭০, বয়স ১৪

সে কি, পূজা সংখ্যায় নাটক নেই আবার কি কথা? ভালো করে আরেকবার দেখ তো। লেখা ভালো হলেই ছাপানো হয়। কার্ড পেয়েছ তো?

(১৮) মণিদীপা চৌধুরী ৫৭৬, বয়স ১২

পূজা সংখ্যা উপভোগ করেছ জেনে ভালো লাগল। হ্যাঁ, পুরণো সন্দেশের আলাদা সংখ্যাও কেনা যায়। সন্দেশের পাতায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাতে দেখো কি কি পাওয়া যাবে। 'রা-কা-যে-টে-না-পা' আপাততঃ পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ ঐ সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। আবার ছাপা হলে, পাবে। তোমার বোনদের কার্ড পাঠাব। পত্রবন্ধু চাই; শখ:—বইপড়া ও গল্প লেখা, ডাকটিকিট ও দেশলাই বাক্সের ছবি সংগ্রহ, ছবি আঁকা।

(৯) ১৬৬৯ বাণী মুখার্জী, বয়স ১৪ বছর—তোমার দাদা সন্দেশের গ্রাহক, অমিতাভ মুখার্জী সারা ভারতীয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে ও N. S. T. S. S. Testএ দ্বিতীয় হয়েছে একথা তোমার চিঠিতে জেনে খুব সুখী হলাম। তাকে আমাদের অভিনন্দন জানিও।

তুমিও বড় হলে এইরকম ভাল করবে ত?

## প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর।

# রাতের আকাশ

জীবন সর্দার

গত শরতের একমাস হিমালয়ের পথে পথে হেঁটেছিলাম। দিনের শেষে রাতের জন্য যেখানে থামতুম, সেখানে, মেঘ কাটলেই পাখিদেখা পোকাদের ডাকশোনা ফুলতোলা বা পাথরকুড়োনো বন্ধ রেখে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতুম। আর কিছু দেখতে শুনতে ভালো লাগতো না।

চাঁদের আলো যখন থাকতো না, তখনই প্রায় কালো আকাশের গায় তারাগুলির যত দপদপানি। শুধু শুধু আর কতক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায়। এক সময়ে আনমনে আমি তারা গুনতে শুরু করে দিতুম।

তারা গুনছি কথাটা ভাবতেই হাসি পায়। সত্যি বলছি, আমি দু'একজন লোকের কথা পড়েছি যাঁরা খালি চোখেই তারা গুনতেন। খালি চোখে দেখে তারার একটি তালিকা বানিয়েছিলেন চীন দেশের জ্যোতি-বিজ্ঞানী শি শেন। সে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। আর, শুধু ঝকমকে তারাগুলির তালিকা বানিয়ে-ছিলেন গ্রীক জ্যোতিবিজ্ঞানী হিপারকাস্। তারাদেখা আর তারাগোনার কাজগুলি ওঁদের সারতে হয়েছিল খালিচোখেই—সেকথা মনে পড়ায় আরো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থাকতাম রাতের আকাশের দিকে।

তখনই একদিন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল—আসলে তারাগুলি কি? কেমন করে আটকে আছে আকাশের গায়? ছোটবেলার বইতে যতটুকু পড়েছিলাম তার বেশি কিছু আমার তখন জানা ছিল না। আমি যদিও পুরাকালের লোকদের মতো ভাবতুম না—আকাশটি কাঁচের আর তার গায়ে তারাগুলি আঁটা, তবুও, তারারা চাঁদের মতো ওঠেনা বাড়েনা কমেনা দেখে, তাদের রহস্য তাদের চলাফেরা আমি বুঝতে পারিনি বহুদিন। আসলে, খালি চোখে অনেক কিছুই ধরা পড়েনা বলে এই ধারণা আমার মনে জমাট বেঁধে ছিল।

খালি চোখে শুকতারা ছাড়া আর কোন গ্রহ আমি চিনতে পারিনি। শুকতারার উদয় অস্ত দেখে গ্রহদের চলাফেরায় আমার কোন সন্দেহ জাগেনি। কিন্তু একটি একটি তারার গতি বুঝব কি করে? তা' বুঝতে না পেরে তার দল খুঁজবার চেষ্টা করলাম। কিছু তারা মিটমিট করে আলো দেয়, কোনো কোনো তারার আলো ঝকমকে। লাল সবুজ হলুদ নীল শাদা সব রং এরই তারা চোখে পড়তো। মিটি মিটি নিবু নিবু তারাগুলো ছেড়ে দিয়ে ঝকমকে বড় তারাগুলো একটির সাথে আর একটি কাল্পনিক রেখা দিয়ে জুড়ে একটি ছবির আদল আনবার চেষ্টা করতুম। মাছ পাখি বা পশুদের আকার আমি রেখায় রেখায় তারা জুড়ে আঁকতে পারতুম না। কিন্তু হাতা বাটি ত্রিভুজ চতুর্ভুজ সহজেই হয়ে যেত। সবচেয়ে খুশি হয়েছিলাম সেদিন যেদিন উত্তরাকাশের সাতটি ঝকমকে তারা কাল্পনিক রেখায় জুড়ে হাতার মত আকার দেখেছিলাম। সপ্তর্ষি মণ্ডল আর ধ্রুবতারার কথা

ছোটবেলায় পড়েছিলাম, রাতের আকাশে কোনদিন খুঁজে দেখিনি তাদের। কল্পনার রেখায় গড়া তারার হাতাটিই যে সপ্তর্ষি বুঝতে পেরে নেচে উঠেছিলাম। ধ্রুবতারা তার জায়গায় ঠায় 'বসে' আছে মনে হয়। আকাশের সবখানের সব তারাগুলি বেদম বেগে তাদের কক্ষে ছুটছে। পৃথিবীতে বসে তাদের ছোটা দেখতে না পারলেও তাদের জায়গা বদল হলে বুঝতে পারা যাবেই। আমি ভাবছি, সপ্তর্ষি মণ্ডলের তারাগুলিও তো ছুটছে, একদিন, এখন যে যেখানে আছে সে আর সেখানে নাও থাকতে পারে। এখন কাল্পনিক রেখা দিয়ে জুড়লে তাদের দেখায় হাতার মতো, সেদিন দেখবে কেমন?

তারা দেখতে দেখতে আমার নজর চলে যেত ছায়াপথের দিকে। আকাশগঙ্গা বলে কোথাও কোথাও। ধোঁয়াটে ফিকে আলোর একটি নদী আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত বয়ে গেছে। তাতে না আছে জোয়ার ভাঁটা না আছে ঢেউ। আমি মোটেই খুশি হতাম না আকাশগঙ্গা দেখে। তার অর্থ বোঝা যায়না খালি চোখে। ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা সত্যি সত্যি নদী নয়। আলোর নদীও নয়। যতটা আমরা ভাবতে পারি তারচেয়ে আরও অনেক বেশি তারার দল, কোটি কোটি তারার দল নিয়ে ঐ আকাশগঙ্গা। আমাদের সূর্য তার গ্রহ আর যত তারা দেখতে পাই, সবাই ঐ ছায়াপথে আপন আপন কক্ষের 'পথিক'—এ কথা আমি বই পড়ে জেনেছি। তখনই আমার জানা হয়ে গেল তারাগুলি এক একটি মহাসূর্য কিংবা গ্যাসের অতিকায় অগ্নি গোলক। তারার ভেতর গ্যাসের অণু পরমাণুগুলো ফাটছে জ্বলছে। তাপ দিচ্ছে আলো ছড়াচ্ছে। একক তারা কোথাও নেই দল বেঁধে বা বিশেষ মণ্ডলে 'ধরা' দিয়ে তারা ঘুরছে।

আমার হিমালয়ে যে কটি রাতে আকাশ ছিল কালো তারারা ঝকমকে। মেঘ বা কুয়াশা দৃষ্টি আড়াল যখন করতে পারেনি তখুনি ছায়াপথের এমাথা থেকে ও মাথা বার বার দেখতুম। ফিকে আলোর ছায়াপথটি দু'এক জায়গায় ঘন হয়ে স্বচ্ছ চাঁদের মতো দেখাতো। যেন ফিকে রংএর জল জমাট বেঁধেছে। পরে শুনেছি ঐ খানেই লক্ষ তারার মেলা—বিজ্ঞানীদের ভাষায় যাকে বলে এনড্রোমিডা।

ছায়াপথ ছেড়ে আবার তারার দিকে মন দিতাম। ঝকমকে তারাগুলি দেখে ভাবতুম ওগুলো কাছের, আর দূরের তারাগুলি মিটমিট করে। যত জ্যোতি তত কাছে—তারার দূরত্ব মাপার আমার এই নিয়ম বাতিল করে দিয়েছি বিজ্ঞানীদের লেখা পড়ে। এমনও তারা আছে যা অনেক দূরে থেকেও ঝকমকে অথচ তার তুলনায় পৃথিবীর কাছের তারা অনেক মিটমিট আলো ছিচ্ছে। যদি তারা দেখার যন্ত্র একটি কাছে থাকতো, আরও ভালো আরও বেশি কিছু দেখে পেতুম—রোজ রাতেই একথা ভেবেছি। আশ্চর্য, রোজই খালি চোখে নতুন কিছু কিছু দেখেছি।

চাঁদের উদয় অস্ত, তার বাড়াকমা রোজই নতুন ঠেকত আমার চোখে। সন্ধ্যায়, মাঝরাতে বা ভোররাতে তারাময় আকাশের পট একটু একটু বদলে যেত লক্ষ্য করেছি। কোনো তারা অস্ত যেত, নতুন কিছু দেখা দিত। এতসব দেখার মাঝে উল্কা দেখার চমক পেতাম সবচেয়ে বেশি। আকাশের একোণ থেকে ও কোণে কিংবা উপর থেকে নীচে সোজা উল্কা ছুটে যেত, হঠাৎ জ্বলে উঠে কিছুদূর উড়ে গিয়ে মিলে যেত তার আলো। হলুদ কিংবা শাদা, দুএকটি খুব শাদা হয়ে জ্বলে যেত। কোথা থেকে কত উঁচু থেকে ওরা আসে আর কোথায় চলে যায় বুঝতে পারতুম না।

ছোট বেলায় উল্কা দেখলে মুনি ঋষিদের নাম নিতাম। অজা বিপদের কবলে যেন না পড়ি। এখন ভাবি উল্কা দেখার ভয়ের কি! ওরা যে সব আকাশে ভাসা নানান গ্রহ উপগ্রহ থেকে ছিটকে আসা কণা, পৃথিবীর উপরের বাতাসে এসে ঘসা খেয়ে জ্বলে গিয়ে ছাই হয়ে যায় একথা তোমরাও জানো। আমি হিসেব

রাখতুম একরাতে কটি উল্‌কা দেখা হোলো, কোনদিক থেকে এসে তারা কোনদিকে গেল, কতক্ষণ আলো ছিল তাদের আর কি রংএর আলো।

আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমে চোখ বুজে আসার আগে তারার আলোয় অনেক ভাবনার সংকেত পেতাম। মনে হোতো পৃথিবীর দেশ দেশান্তরে যেমন জলহাওয়ার হেরফেরে পাছপালা আর প্রাণীর হেরফের তেমনি তারার আলোর রংএ এমন সংকেত হয়তো আছে—কেমন করে তৈরী তারাগুলি কি দিয়ে তৈরী। আলাদা রং মানে হয়তো আলাদা উপাদানে তৈরী, ভিন্ন ভিন্ন উত্তাপ তাতে। ভিন্ন দিকে গতি। অনেক মানুষ অনেক কিছু দেখেছে, কেউ কিছু না কিছু দেখেছে কিন্তু প্রকৃতি-পড়ুয়া না হলে সবকিছু কি দেখা যায়।

---

# মন্ত্রী-রাজায়

**অমিতশংকর দাশগুপ্ত**

টুনটুনিটা টুনটুনাল
রাজা-রাণী গাল ফুলাল।
মন্ত্রীমশায় তাই না দেখে
পাগড়ীখানা খুলে রেখে
গেলেন ছুটে
কিনতে ঘুঁটে।
কিনতে ঘুঁটে গেলেন ছুটে মন্ত্রীমশায়,
সেই সুযোগে দ্বারী জানায়,
'ঝগড়া-ঝাঁটি করে কেবল মন্ত্রী-রাজায়।'

তাই না শুনে দিন দুপুরে টোপর মাথায়
কেবল লাফায়
রাজামশায়।
টোপর মাথায় রাজমশায় কেবল লাফায় দিন দুপুরে,
খাটের কোণে মুখটি ঢেকে কাঁদেন রাণী নাকী সুরে।
খবর পেয়ে কামান দেগে এলেন ছুটে মন্ত্রীমশায়,
সেই সুযোগে দ্বারীবেটা রাজসভাতে আবার জানায়,
'মন্ত্রী রাজায়
বগল বাজায়।'

# ক্রীড়াজগৎ

অজয় হোম

এখন ক্রিকেটের মরসুম। সর্বত্র পুরোদমে চলছে। দুটি বিদেশী দল এবার ভারতে। কিন্তু একটা ফুটবল খেলার কথা ভুলতে পারছি না। মোহনবাগানের এরকম ভালো খেলা বহুকাল দেখি নি। সেটা হচ্ছে আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা—

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান কল্পনাতীতভাবে উন্নতি করে চলছিল সুপার লীগের শুরু থেকে। তার পূর্ণ বিকাশ হল ফাইনাল খেলায়। মোহনবাগানের কাছে ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা হল ঠিক দিল্লিতে ইয়াংগজির বিরুদ্ধে যা হয়েছিল। মোহনবাগান ৪-২-৪ পদ্ধতির খেলা বেশ রপ্ত করেছে। ইস্টবেঙ্গল সমস্ত লীগের খেলা খেলল ৩-২-৫ প্রথায় কিন্তু ফাইনালে এসে ৪-২-৪। তা কি কখনও খেলা যায়? এর জন্যে চাই কোচিং ও পরিকল্পনা। এ দুটোই মোহনবাগান নিয়েছে কোচ শ্রীঅমল দত্তের কাছ থেকে। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম থঙ্গরাজের দোনামনা ভাব। গোলরক্ষকের মনে দোনামনাভাব উদয় হলে তার অবসর গ্রহণ করাই উচিত। ইস্টবেঙ্গলের হারের মূলে ছিল থঙ্গরাজ আর মোহনবাগানের জয়ের মূলে ছিল লেফট আউট প্রণব গাঙ্গুলীর ক্রীড়া দক্ষতা এবং শ্রীঅমল দত্তের কোচিং।

কলকাতার মাঠে লীগ-শীল্ড দুইই সুষ্ঠভাবে সমাপ্তির জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় পরিচালক সমিতি এবং রেফারিদের।

কলকাতায় ফুটবলের যবনিকা পড়লেও, জাতীয় ফুটবল জুনিয়র জাতীয় ফুটবল, মারডেকা প্রতিযোগিতা শেষ হলেও রোভার্স-ডুরাণ্ডকে কেন্দ্র করে আরও কিছুদিন আমাদের মনে ফুটবল জেগে থাকবে। আসামের নওগাঁ থেকে সম্প্রতি যেভাবে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বাঙালি দল উন্নত কলাকৌশল এবং বিক্রমের মধ্যে বিজয়ীর সম্মান নিয়ে 'সন্তোষ ট্রফি' ঘরে এনেছে, তাতে বাংলার ফুটবল আবার বেঁচে উঠবে এ আশাই মনে জাগছে। বাংলার সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে ৬-১ গোলে জয় জাতীয় ফুটবল ফাইনালে বেশি গোলে জয়ের নতুন রেকর্ড।

## ক্রিকেট

নিউজিল্যণ্ড এসে চলে গেল পাকিস্তান সফরে। সেখানে রাবার জিতেছে। নিউজিল্যণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ভারত ৬০ রানে জিতলেও দ্বিতীয় টেস্টে হেরেছিল ১৬৭ রানে। তৃতীয় টেস্টে জয়পরাজয় নিস্পত্তি হয় নি। ভারত কোনও মতে জোর করে সময় চুরি করে মান ও রাবার বাঁচিয়েছিল বৃষ্টির আড়ালে। কাগজে-কলমে ড্র হলেও নিস্পত্তিটা খেলোয়াড়ি মনোভাবের হয় নি। অগৌরবের কলঙ্ক এসে লেগেছে ভারতের গায়ে। দ্বিতীয় টেস্টে অম্বর রায়ের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল যেমন দর্শকরা তেমন হয়েছিল রেডিও ভাষ্যকারগণ এবং কর্মকর্তারা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ভারত হেরেছে। সেটা খুব অগৌরবের নয়, কারণ অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দল। সরকারী আইনে হয়তো তা নয় কিন্তু প্রতিটি দেশ তা স্বীকার করে নেবে। তাই অধিনায়ক বিল লরির 'আমি সব খেলাই জিততে চাই এবং সব খেলার জয়ের জন্যে আমি সম্ভবত সর্বশক্তি নিয়োগ করব' এই উক্তি দাম্ভিকতার নয় গম্ভীর আত্মবিশ্বাসের। এই আত্মবিশ্বাস অর্জন করা চারটিখানির কথা নয়। ভারতীয় খেলোয়াড়রা যদি এর জবাবে বলতে পারত 'সব খেলা জিততে তো দেবই না বরং আমরা তোমাদের একটা না একটা টেস্টে হারাবই' তবে সেটা হতো সুখের। ক্রিকেটে আত্মবিশ্বাস সাফল্যের এক বড়ো হাতিয়ার। তা অর্জন করতে কি আমরা পারব?

প্রথম টেস্টে খেলোয়াড়োচিত মনোভাব দেখিয়েছে বাংলার সুব্রত গুহ। দেশের স্বার্থে দলের স্বার্থে সে নিজের স্থান অপরকে অর্থাৎ বেঙ্কটরাঘবনকে ছেড়ে দিয়েছে। সুব্রত উচিত কাজই করেছিল। টেস্টের ইতিহাসে দল গঠন করার পর মাঠে এসে শেষ মুহূর্তে খেলোয়াড় পরিবর্তন এই প্রথম।

উচিত ছিল জন পনেরর নাম রাখা এবং মাঠে এসে অধিনায়কের দল গঠন করা। আশ্চর্য লাগে বোম্বাইবাসী বিজয় মার্চেন্টের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যিনি এবার দলসংগঠনকারীদের চেয়ারম্যান এবং বাকি কজনও সবার টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা বোম্বাইয়ের মাঠ চেনেন না বা মাঠেরর অবস্থার খোঁজ রাখেন না। আগের দিনও তো দল বদলাতে পারতেন কিন্তু মাঠে এসে নামার মুখে সুব্রত গুহকে অনুরোধ করা কি রকম যেন বিসদৃশ ব্যাপার।

এই খেলায় পতৌদির অধিনায়কত্ব অনেকের পছন্দ হয় নি। ভারতের হারার একটি কারণ অধিনায়কের গলদের জন্যে। একটি উদাহরণ দিই। বোরদের বয়েস হয়েছে, চোখে কম দেখেন সেটা ঠিকই। বর্তমানে খেলেন অভিজ্ঞতার জোরে। যেভাবেই হোক পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে দলভুক্ত হয়েছেন।

তাঁকে ওয়ান ডাউন অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে পাঠানোর কোনো যুক্তি নেই। ওখানে ওয়াদেকার খেলতে পারত আর সেটাই তার স্থান। ওয়াদেকার যেখানে খেলেছে সেই ষষ্ঠস্থানে বোরদে খেললে হয়তো ভারত তাঁর কাছ থেকে কিছু রান পেতে পারত।

ভারত টসে জিতে ২৭১-এর জায়গায় চারশ'র মত রাণ করতে পারলে এই খেলা যেত ভারতের অনুকূলে। তাও যখন পারল না তখন অমীমাংসিতভাবে খেলাটা অন্তত: শেষ করা উচিত ছিল। সেটা হল না কেন? কার দোষ?

প্রথম টেস্টে ব্যাটিং-এ অশোক মানকড়, পতৌদি ও ওয়াদেকার এবং বোলিং-এ প্রসন্ন ও বেদীর তুলনা হয় না।

দ্বিতীয় টেস্ট্ শুরু হচ্ছে কানপুরে। দলসংগঠনকারীরা একেবারে চারজনকে বাদ দিয়ে চারজন নতুনকে নেওয়াতে খুবই সাহসের পরিচয় যেমন দিয়েছেন তেমন সামনে রেখেছেন দৃষ্টান্ত যে কোনো খেলোয়াড়ই অতীত দিনের খেলার সুবাদে মৌরসী নিয়ে আসে নি। এই রকম কড়া হলেই খেলোয়াড়রাও সচেতন হবে। বর্তমানে সেটা খুবই দরকার হয়ে পড়েছে।

তোমরা যতদিনে সন্দেশ পড়বে, ততদিনে তিনটি খেলার ফলাফল জেনে যাবে।

নোটন—'জানো দাদু, কাল ত বড়দিন। আজ রাতে নেলা আর টমি ওদের মোজাগুলো খাটে ঝুলিয়ে রাখবে আর স্যাণ্টা ক্লস এসে তাতে খেলনা, পুতুল, টফি-চকোলেট ভরে দিয়ে যাবে!'

ছোটন—'স্যাণ্টা কেন আমাদের বাড়ি আসে না দাদু? আমাদের খেলনা দেয় না কেন?'

দাদু—'কেন আসবে? তোমরা ত তাকে ডাকো না, মোজা ঝুলিয়ে রাখনা ত?'

সে রাতে নোটন-ছোটন তাদের মোজা ঝুলিয়ে রাখল, 'স্যাণ্টা আসবে ত?'—ভাবতে ভাবতে তারা ঘুমিয়ে পড়ল। দুপুর রাতে চমকিয়ে উঠল—এসেছে! এসেছে!! মিটমিটে আলোয় দেখল ঠিক যেমন বাইরে ছবি থাকে—লাল পোষাক, সাদা দাড়ি গোঁফ গোলগাল বুড়ো মোজার মধ্যে কি ভরছে!

অবাক হয়ে ওরা দেখছে, হঠাৎ 'হ্যাঁ—চ্চো! হ্যাঁ—চ্চো! ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ!'

আরে! এ-হাঁচি যে খুব চেনা হাঁচি! তড়াক করে উঠে দুজনে স্যাণ্টাকে ধরে ফেলল, একটানে উড়ে গেল লাল-টুপি আর সাদা দাড়ি গোঁফ, বেরিয়ে পড়ল দাদুর টাক মাথা আর ফোকলা মুখ! তখন কেবল হা-হা-হা-হা-হা, হো-হো-হো-হো, হি-হি-হি-হি-হি! মা বললেন—'দেখেছ, দাদু তোমাদের কত ভালবাসেন! বুড়োমানুষ, এই শীতে কোথায় লেপমুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমোবেন, তা-নয় তোমাদের খুশি করার জন্য এত কাণ্ড করেছেন! আপনাকে এক কাপ গরম চা দেব বাবা? ঠাণ্ডা লেগেছে নিশ্চয়—'

'ঠাণ্ডা নয় মা, ফ্যাঁচ! ঐ তুলোর গোঁফের সুড়সুড়িতে—হ্যাঁচ্চো!!'

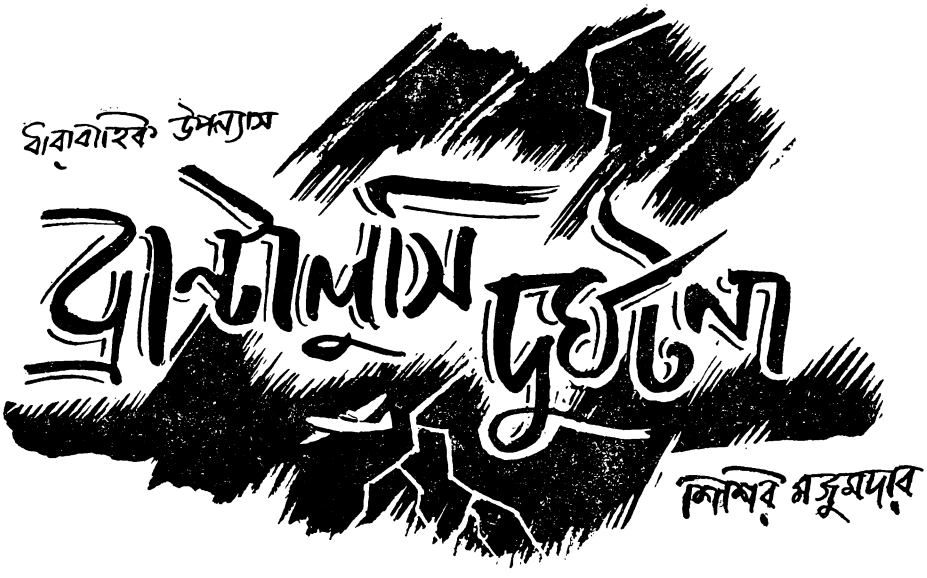


( পনের জন ভারতীয় স্কুলের ছেলেমেয়ে, প্রেসিডেন্ট ব্রোকেনসিলের নিমন্ত্রণে, টণ্টামোরা রাজ্যের স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দেবার জন্য প্লেনে করে আসছিল রাজধানী টাণ্টামোরায়।

ব্রাণ্টালুসি পর্বত ও ঘন জঙ্গলময় উপত্যকার উপর দিয়ে যাবার সময়ে প্লেনটি প্রবল ঝড়ের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যায়।

পাইলট ক্যাপ্টেন গাক্কা কণ্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে রেডিওর সাহায্যে যোগাযোগ করেছিলেন কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

ক্রমে বিশ্বের সকলেই এই দুর্ঘটনার সংবাদ জানতে পারল। প্রেসিডেন্ট ব্রোকেনসিল সাময়িকভাবে সব আনন্দ উৎসব বন্ধ করে দিলেন। ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই উদ্ধারকারী দল অনুসন্ধানের কাজ সুরু করল )

২

সারা রাত তর্জে গর্জে ভোর রাতে হঠাৎ ঝড়ের বেগ কমে গেল। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। পাহাড়ের কোলে তির্নিকা গ্রামের লোকগুলো সব এতক্ষণ কোন মতে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বসে ভগবানকে ডাকছিল। ঝড় থামতেই তারা লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট ব্রোকেনসিল।

—তোমরা তৈরি?

সবাই বলল—হ্যাঁ।

কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল—স্কুলের হেডমাস্টার আরডন কই? আরডন! সে না হলে তো কোন কাজই হবে না। এ পাহাড় ঐ জঙ্গল তো কেবল চেনে সেই। পিঠে হ্যাভারস্যাক বেঁধে হাতে পাহাড়ি লাঠি নিয়ে আরডন এগিয়ে এলেন সামনে—আমি হাজির!

—মিডি। —হাজির।

—কিকু। —হাজির।

—হকো। —হাজির।

—সঙ্গে যারা যাবে তারা তৈরি?

—হ্যাঁ!—একদল গ্রামের লোক এগিয়ে এলো।

আরডন বললেন—মিডি তুমি দশজন লোক সঙ্গে নিয়ে পূর্বের পাহাড়ি সিরদাঁড়া বেয়ে উঠবে। তোমার লক্ষ্য চকমীর তাক। সেখানে পৌঁছে—খুঁজবে প্লেন পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে কি না। সঙ্গে রেডিও আছে?

—আছে। উত্তর দিল মিডি।

—প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিস!

—আছে।

—পাহাড়ে চড়ার দড়ি দড়া।

—আছে।

—তাহলে রওনা হয়ে যাও। শুভকামনা রইল।

—ধন্যবাদ। মিডি তার দল নিয়ে গভীর অন্ধকারে পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

—কিকু—! ডাকলেন আরডন।

—হাজির হুজুর, বলল—কিকু—। ও তিনিকা গ্রামের ঝাড়ুদার।

—তুমি প্রথম সৈন্যদলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

—যেমন হুকুম হুজুর।

—তুমি যাবে উত্তরের হাঁটা পথ ধরে। পাহাড়কে বেড় দিয়ে নিচে নিচে। পাহাড়ের ওপারে গিয়ে সারা উত্তর জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খোঁজার দায়িত্ব কিন্তু তোমার। প্রতিটি সৈন্য তোমার হুকুম মেনে নেবে। মনে থাকে যেন তোমার ওপরে আমরা নির্ভর করছি সব চেয়ে বেশী।

—হুজুর আমি প্রাণ দেব মান দেব না। বলল কিকু।—কিন্তু একটা কথা বলতে চাই হুজুর।

প্রেসিডেন্ট ব্যস্ত হয়ে বললেন—বল তুমি কি বলতে চাও।

মাটি অবধি ঝুঁকে পড়ে কিকু বলল—আপনারা সবাই কিন্তু হুজুর একটা কথা একদম ভুলে গেছেন।

—কি কথা! জিজ্ঞাসা করলেন প্রেসিডেন্ট।

—আজ্ঞে হুজুর—গ্রাটেনকোর কথা। মাজিনকোর জঙ্গলটা কিন্তু ঐ শয়তানের রাজত্ব।

চমকে উঠলেন প্রেসিডেন্ট। আরডন বললেন—আচ্ছা মিডিরা কি সঙ্গে বন্দুক নিয়ে গেছে? তোমরা কি কেউ বলতে পার এ কথা?

গ্রামের কেউই একথার কোন উত্তর দিল না। সবাই অন্ধকারে এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল।

তাইতো শয়তান গ্রাটেনকোর কথা তো কই কারও মনে ছিল না।—কি হবে তাহলে!

কিকু বলল—হুজুর—এই তো হপ্তা খানেক আগেই ও সয়তান টোপ্‌কীর শেষ পুলিস চৌকীতে হানা দিয়ে অস্ত্র সস্ত্র গোলাবারুদ লুটে নিয়ে গেছে। উড়ো জাহাজ পড়ার খবর কি ওর অজানা আছে। যদিও বা কেউ বাঁচে—ও তো ভোর হবার সাথে সাথেই সেখানে গিয়ে সবাইকে মেরে ফেলে—সব কিছু লুট করবে। দয়া মায়া কি ওর আছে। ও ডাকাত নয় হুজুর ও শয়তান। নিজেকে ঝাঁকানী দিয়ে সামলে নিলেন হেডমাস্টার আরডন।

বললেন—ও কথা আর এখন ভেবে তো লাভ নেই কিকু। তুমি দেরী না করে এগোও। যদি দেখ ও শয়তান আমাদের সবার মাথা হেঁট করে দিয়েছে। তবে তাকে তুমি ক্ষমা করে এসোনা কিকু।

—যা হুকুম হুজুর। বলল কিকু—এ কথা কি বলতে হবে। আমার ছোট ভাই কিফু মরেছে ওর ঠাণ্ডা গুলিতে। ওকে পেলে আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেব হুজুর।

প্রেসিডেন্ট বললেন—সে তো পরের কথা কিকু। এখন তুমি এগোও।

বিরাট সেলাম ঠুকে এগিয়ে গেল কিকু দূরের ছোট ময়দানের দিকে। যেখানে সৈন্যদল এগোবার জন্য ছটফট করছে।

—হকো—ডাকলেন আরডন।

—আমিও হাজির স্যার—এগিয়ে এসে উত্তর দিল হকো—

—তুমি যাবে দক্ষিণের ঘোরা পথে পাহাড় বেড় দিয়ে। টিবলি নদীর গিরিখাদ ধরে। চকমীর তাকের নিচে পৌছে মিডির সাথে রেডিও যোগাযোগ করবে। কোন খবর না পেলে সেখানে নদী পার হয়ে দক্ষিণের সারা জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজবে। তোমার লাগবে অন্তত বারদিন সময়। সঙ্গে নেবে কুড়ি জন সৈন্য। সে আন্দাজ রসদ সরঞ্জাম। তোমার দলের সাথে যোগাযোগ কর এক্ষুনি। প্রথম আলোর সাড়া জাগলেই তুমি বার হয়ে পড়বে! ঠিক আছে সব?

—ঠিক আছে স্যার। বলল হকো। হকো স্কুলের ছাত্র এবারেই ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দেবে। হেডমাস্টার আরডনের পাহাড় চড়া দলের এক নম্বর ছেলে।

হকো প্রেসিডেন্টকে স্যালুউট করে পিঠের হ্যাভারস্যাক সামলে এগিয়ে গেল।

গোয়ালাদের বড় বউ গল্‌নো তখুনি হাঁফাতে হাঁফাতে চড়াই ভেঙ্গে উঠে এলো সেখানে। বিড় বিড় করে বকছে ও তখন আপন মনে। বয়স তো বুড়ির কম হল না। ও বলছে।—এমন কথা তো বাপু কেউ কোন দিন শোনে নি। বিপদ হলে আসবে না। আসব—নিশ্চই আসব। সবাই কত কাজ করছে। তা বাপু আমি বুড়ি তো আর পাহাড় চড়তে পারব না। আমি আমার মতন কাজ করব।—কইগো কোথায় গেলে তোমরা সব। পাহাড় চড়ার আগে এসো। এসে—আমার নিজের ঘরের গরুর দুধ গরম করে এনেছি—খেয়ে গায়ে জোর করে যাও। তবেই না পাহাড় চড়ে মার কোলের বাছাদের খুঁজে বার করতে পারবে। আয় বাবারা আয় দেরী করিস না।

প্রেসিডেন্ট নিজে এগিয়ে এলেন—বললেন। দাও বুড়ি মা তোমার গরুর দুধ আমি নিজের হাতে সবাইকে দেব।

—দে বাবা তাই দে। এতটা পথ ছুটে আসতেই আমার দম বার হয়ে গেছে একেবারে।

প্রেসিডেন্ট দুধের পাত্রটা হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

ক্রমে চারদিক ফর্সা হয়ে গেল। কাল অত ঝড় জল। আজ আকাশে তার চিহ্ন মাত্র নেই। না, এক টুকরো মেঘ পর্যন্ত নেই। আবহাওয়া আফিস খবর দিয়েছে আর ঝড়ের সম্ভাবনা নেই—

ইস্কুল ঘরে বসে হেডমাস্টার আরডন ছটফট করছিলেন। বাইরে আলোর আভাস পেতেই উঠে দাঁড়ালেন।

প্রেসিডেন্ট বললেন—এর পরে কি করতে হবে মাস্টার মশাই? আরডন চেচিয়ে ডাকলেন—হকো।'

কাছেই কোথাও হকো অপেক্ষা করে ছিল। বলল—আমি এখুনি রওনা দিচ্ছি স্যার।

—সাবধান—বললেন আরডন—নদী খাতে সন্ধ্যেবেলা হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। মনে থাকে যেন কথাটা।

—থাকবে স্যার।

—আচ্ছা এগোও। হুকুম দিলেন আরডন।

—এর পরে? —ফের জিজ্ঞাসা করলেন প্রেসিডেণ্ট।

আরডন টেবিলের উপরে একটা ম্যাপ বিছালেন। —এখানে এসে দেখুন আপনি। ম্যাজিনকোর জঙ্গলের একটা মোটামুটি ম্যাপ আমি করে রেখেছি। ওর থেকেই বুঝতে পারবেন আমি কি করতে চলেছি—আর কি করব।

টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন প্রেসিডেণ্ট। সঙ্গে সঙ্গে এগোলেন্ সেনাবাহিনীর প্রধান। দুজনেই গভীর আগ্রহে ঝুঁকে পড়লেন ম্যাপের উপরে।

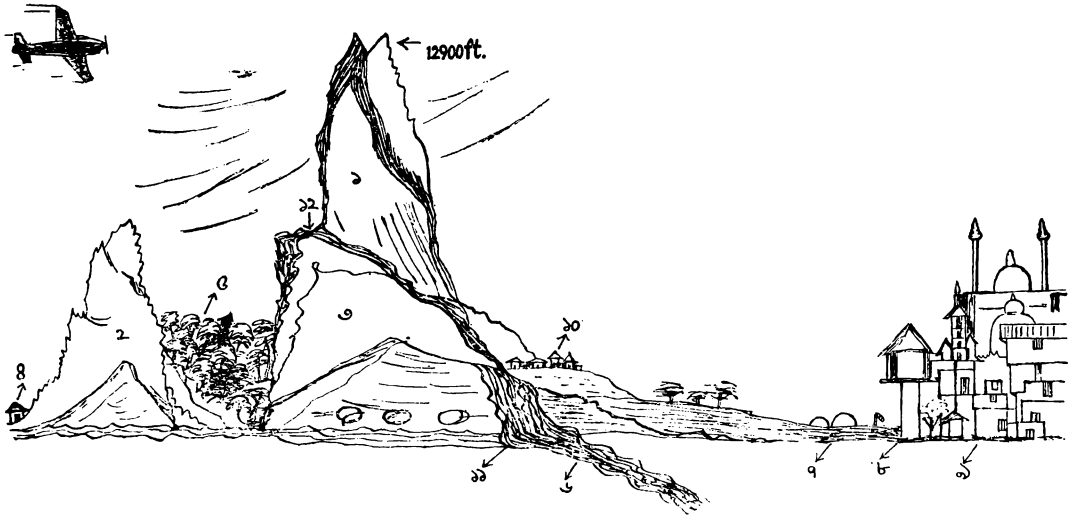


১. বড় ব্রাণ্টালুলি
২. ছোট ব্রাণ্টালুসি
৩. পূর্বের সিরদাঁড়া
৪. টোপকির শেষ পুলিশ চৌকি
৫. জঙ্গল মাজিনকো
৬. টিবল্লি নদী
৭. বিমান বন্দর
৮. রেডিও কনট্রোল
৯. সহর টাণ্টামোরা
১০. পাহাড়ি গ্রাম তির্নিকা
১১. ব্রাকা জলপ্রপাত
১২. চকমির ডাক

—হাওয়া অফিসের খবর মতন আর কণ্ট্রোল টাওয়ারের শেষ যোগাযোগের কথা মনে রেখে আমি প্লেনের ধ্বংসস্তূপকে মোটামুটি এই জায়গায় পাব বলে মনে করি। ম্যাপের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালেন আরডন।

—তাহলে টিবল্লির মরা খাদকে আর মাজিনকোর গভীর জঙ্গলকে আমি একরকম বাদই দিচ্ছি। আমার মনে হয় সেখানে কোন কিছুই পাওয়া যাবে না।

একটু কেশে জেনারেল—আরশ্চেনো বললেন—কিন্তু আপনার ধারণা যদি গোড়াতেই ভুল হয়?

—সে সম্ভাবনার কথা আমি ভুলিনি। তাই তো আমার সব থেকে বিশ্বস্ত ছাত্র হকোকে পাঠালাম ওপথে। আমার ভুল ও শুধরে নিতে পারবে। হেসে জেনারেল আরশ্চেনো প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রেসিডেন্ট আপনার শিক্ষাদফতর থেকে মাননীয় শিক্ষক মহাশয়কে বদলি করে আমার প্রতিরক্ষা দফতরে দেওয়া হোক! আমার সেনাবাহিনী যোগ্য লোকের হাতে পড়েছে।

—ধন্যবাদ। বললেন আরডন।—দক্ষিণ মাজিনকোর পথ দুর্গম জঙ্গলও গভীর। তাই হকোকে সময় দিয়েছি বার দিন। আমার ধারণা ঠিক হলে তার আগেই আমরা আমাদের কাজ শেষ করতে পারব।

—তারপর?···প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন।

—ছোট ব্রাণ্টালুসির উত্তর দিকে ঘেঁসে এই জায়গাটা দেখুন। যতদূর খবর পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় এখানেই কোন একটা গুহায়—শয়তান গ্রাটেনকোর আস্তানা। কিন্তু তা বলে মনে করবেন না যেন উত্তর ম্যাজিনকোতেই কেবল তার রাজত্ব।—বললেন আরডন।

—ও শয়তানের রাজত্ব উত্তরে উত্তর মাজিনকো মালভূমির শেষ থেকে সুরু করে দক্ষিণে দক্ষিণ মাজিনকো মালভূমির শেষ পর্যন্ত। আর পূর্বে তিনিকাগ্রাম থেকে সুরু করে পশ্চিমে টোপকীর শেষ পুলিশ চোকি পর্যন্ত। এ সমস্ত অঞ্চলটাই ওর জানা। প্রতিটি গুড়ি পথ গুহা, খাদ ওর মুখস্থ। তাই বার বার চেষ্টা করেও পুলিশ বাহিনী আজও পর্যন্ত ওকে ধরতে পারেনি।

—হুঁ। মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট।—কে জানতো এমন দুর্ঘটনা ঘটবে।

আরডন বললেন—কিকুকে উত্তর পথে পাঠান হয়েছে এ ভেবে নয় যে সে গ্রটেনকোর সব থেকে বড় শত্রু। পাঠান হয়েছে কারণ ও অঞ্চলে মোটামুটি পথঘাট তারই জানা। আশা করি সে তার কাজ ঠিক মতনই করতে পারবে।

জেনারেল আরশ্চেনো বললেন—বেশ, তা নয় হল। কিন্তু আপনার প্রথম দল—তারা গেল কোথায়?

—এই জায়গাটা দেখুন।—আরডন ম্যাপের ব্রাণ্টালুসির দক্ষিণের একটা চিহ্নের উপরে আঙুল রাখলেন। এই হচ্ছে বিখ্যাত চকমির তাক। পাহাড়ের গায়ে বেশ খানিকটা সমতল জায়গা। এর পিছনেই বড় ব্রাণ্টালুসির সব থেকে উঁচু চুড়া। চকমির তাকে দাঁড়িয়ে এই গোটা অঞ্চলটি এমন কি দুটো পাহাড়ের গায়ের প্রতিটি খাঁজ ও তন্ন তন্ন করে দেখা চলে। আমার প্রথম দলকে নিয়ে মিডি গেছে ঐ তাকে।

হাতঘড়িটা দেখলেন আরডন। আমার মনে হয় আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তার কাছ থেকে আমরা খবর পাব।

—চমৎকার—বললেন প্রেসিডেন্ট ব্রকেনসিল।

—আরও কি কিছু করার বাকি আছে আমাদের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বললেন আরডন।—চলুন আপনারা-হেলিক্যপটার তৈরী খবর পেয়েছি কুয়াশাও কেটে গিয়েছে। তিনটে হেলিক্যপটার উড়িয়ে জঙ্গলটাকে আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজব।

জেনারেল আরশ্চেনো বললেন—কিন্তু মিডির কাছ থেকে সঠিক খবর পেয়ে এগোলে হোতনা তাতে উদ্ধারের কাজটা তাড়াতাড়ি হোত।

—হাসলেন-আরডন। বলল—কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন জেনারেল—মাজিনকোর জঙ্গলের সব থেকে ছোট গাছটার বয়স হবে কম করে পাঁচশো বছর। উচ্চতাও কম করে ত্রিশ বত্রিশ ফুট। দিনের বেলায়ও সে

জঙ্গলের মধ্যে সূর্যের আলো ঢোকে না। এমন জঙ্গলের বুকে বিন্দুর মতন একটা প্লেনের ধ্বংসস্তূপকে খুঁজে বার করা কি অত সহজ হবে? মনে তো হয় না। মিডি হয়তো চক্কর তাকে বসে বৃথাই ছটফট্ করবে।

—হুঁ। আবার ও মাথা নাড়লেন প্রেসিডেণ্ট ব্রকেন সিল—চল তাহলে আর দেরী করা নয়।

ঘর থেকে ওঁরা বার হবেন। এমন সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল হোলথ—।

—আরডন। আমরা মিডির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। সে চক্কর তাকে পৌছেচে।

—তাই নাকি। চমৎকার চমৎকার।—উৎসাহ উত্তেজনায় মাথা নাড়তে লাগলেন আরডন।—প্রেসিডেণ্ট আমার মনে হয় এখন তাহলে আসে মিডির সাথেই আলোচনা করে এগোন উচিত।—যেমন বলেছেন জেনারেল।

—নিশ্চয়ই। বললেন প্রেসিডেণ্ট।

ওরা হোলখ্-এর পিছল পিছন আর একটা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। সেখানে তখন ছোট খাট একটা রেডিওর ফিল্ড অফিস বসে গেছে। চার পাঁচজন কানে হেডফোন লাগিয়ে চোঙ্গার সামনে বসে-হ্যালো, হ্যালো করছে আর প্রাণপণে সামনের রেডিও যন্ত্রের চাবি ঘোরাচ্ছে।

—আসুন এদিকে। হোলখ-একটা রেডিও যন্ত্রের কাছে ওদের সবাইকেই ডাকলেন।

প্রেসিডেণ্ট এগোলেন সেদিকে। কিন্তু আরবতন প্রায় ছুটে গিয়ে হেডফোন তুলে কানে ধরে বলল—

—হ্যালো—কে মিডি। সঙ্গে বন্দুক নিয়েছো ত তোমরা? গ্রাটেনকোর কথা বলে তোমাকে সাবধান করে দিতে আমি ভুলেই গেছি। যা দুঃশ্চিন্তায় সময় কাটছে আমার।

ওদিকে একথা শুনে মিডি হাসল—বলল মিথ্যা ও সব কথা ভেবে আপনি ব্যস্ত হবেন না।—মিডি আপনার কাছে পাহাড় জঙ্গলে ঘোরার পাঠ বৃথাই নেয়নি। আমার ভুল অত সহজে হয় না।

—বাঁচালে। বললেন আরডন—শয়তানটা তো মানুষ নয়। যাক এখন ওদিকের কথা বল। তুমি কিছু দেখতে পেয়েছো? দাঁড়াও আগে ম্যাপ পাতি।

একথা বলেই আরডন সামনের টেবিলের পরে আবার ওঁর ম্যাপটা পেতে ফেললেন। ওদিকে মিডিও একটা পাথরের উপরে ওর ম্যাপটা বিছিয়ে নিল।

—নাও এবারে বল কি দেখতে পাচ্ছ। ভাল কথা। কোন খুঁটিনাটিও যেন বাদ না যায়।

—আচ্ছা সার তাই হবে। বলল—মিডি। বলে আরম্ভ করল—

—আমার সামনে আমি উত্তরের মালভুমির শেষ সীমা থেকে দক্ষিণের মালভুমির শেষ সীমা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি সামনেই কুয়াশার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছোট ব্রাণ্টালুসি।

—আঃ। ধমকে উঠলেন আরডন। আসল কথা বল। কিছু কি দেখতে পাচ্ছ কোথাও? কোন মানুষের সাড়া?

—না স্যার। মিডি বলল। নীচে সারা মাজিনকোর জঙ্গল জুড়ে ঘন কুয়াশার চাদর বিছান রয়েছে। সূর্য বড় ব্রাণ্টালুসি পার হয়ে এখন এ পারে আসতে পারে নি ভাল করে। স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

—হেলিক্যপ্টার ওড়ালে কি কিছু সুবিধা হবে?—জিজ্ঞাসা করলেন আরডন।

—না। স্পষ্ট উত্তর দিল মিডি!—আমার কাছ থেকে ফের কথা না শোনা পর্যন্তই আপনারা অপেক্ষা করুন। কুয়াশা কাটতে দেরী হবে বলে মনে হয় না।

—ওঃ। চেঁচিয়ে উঠলেন আরডন। এবারে বিরক্তিতে।

—বেশ তাই হবে। তবে থেকে থেকে কিছু অন্তরই তুমি যোগাযোগ করবে। মনে থাকে যেন।

—উত্তর এলো—আচ্ছা তাই হবে।

হেডফোন নামিয়ে রাখলেন আরডন। প্রেসিডেন্ট থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হল?

—ঘন কুয়াশায় সারা মাজিনকো ঢাকা।—আমাদের অপেক্ষা করতে হবে প্রেসিডেন্ট। উত্তর দিলেন আরডন।

—সর্বনাশ। বললেন জেনারল। —তার মানে তো গ্রাটেনকোকে সময় দেওয়া।

—উপায় নেই বললেন—আরডন। তার থেকে চলুন যাত্রা করার আগে এখন কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

চিন্তিত ভাবে প্রেসিডেন্ট বললেন—বেশ, তবে তাই হোক।

* * *

—উঃ। খুব দূর থেকে যেন কার যন্ত্রণায় কাতর গলার আওয়াজ ভেসে এল। ওর মনে হল—যেন ভীষণ ঘুম থেকে একটু একটু করে জেগে উঠছে ও। আর জেগে উঠছে ঐ একখানা যন্ত্রণা কাতর আওয়াজটা শুনেই। নাঃ—হাত পা মাথা কিছুই নাড়ার ক্ষমতা নেই ওর এখন।—ঘুম ভেঙেও যেন ভাঙেনি।—যেন স্বপ্ন দেখছে ও জেগে।···আঃ। আঃ। উঃ হঠাৎ একটা চিন্তার চমক বয়ে গেল ওর মাথায়।—কি হয়েছে ওর নিজের! কে কাতরাচ্ছে অমন করে।···তবে কি!! কান পেতে ও শুনতে চেষ্টা করল। না প্লেন চলার এক ঘেঁয়ে চাপা গোঙ্গানীর শব্দ তো শোনা যাচ্ছে না।

বাতাসের বুকে ওঠা নাবার ঝাঁকানি তো নেই। নেই হঠাৎ চমকে ওঠা বিদ্যুতের ঝিলিক। চার দিকে শুধু জমাট অন্ধকার।

আস্তে আস্তে ভাল করে চোখ মেলে তাকাল রাণা মজুমদার।

—না প্লেন চলছে না। প্লেনের ভিতরের আলোগুলোও আর জ্বলছে না। গভীর অন্ধকারে সব কিছু অস্পষ্ট চারদিকে।

শুধু থেকে থেকে ঐ এক ঘেয়ে কাতর শব্দটা শোনা যাচ্ছে। উঃ উঃ আঃ।

দুর্ঘটনা ঘটেছে।—কোন সন্দেহ নেই। একটা ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটেছে যে। হঠাৎ খেয়াল হল ওর ও যেন কেমন অদ্ভুতভাবে এলোমেলো শুয়ে আছে উঁচু নিচু এব্‌ড়ো খেবড়ো কি সবের উপরে। কোমরের কাছে সিটের বেল্টটা শক্ত হয়ে এঁটে বসে কষ্ট দিচ্ছে। সেটা খুলে না ফেলতে পারলে আরাম নেই।

হাত নাড়তে চেষ্টা করল রাণা মজুমদার। না সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে।—তবে কি শরীরের কোথাও প্রচণ্ড আঘাত লেগে ওর দেহ পঙ্গু হয়ে গেছে? মনটা যেন কেমন করে উঠল। ওতো বেঁচে আছে! কিন্তু পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকার কষ্ট যে অনেক। না না কিছুই হয় নি ওর। বেল্টটা শুধু শরীরের মধ্যে চেপে বসার কষ্ট ছাড়া তো কোন কষ্ট বোধ ওর শরীরে নেই।

ক্রমশঃ

জল প্রপাত

মিত্রা রায় চৌধুরী—গ্রাঃ সং ১৪২৫ বয়স ১৩ বছর

পাণ্ডুয়ার মন্দির

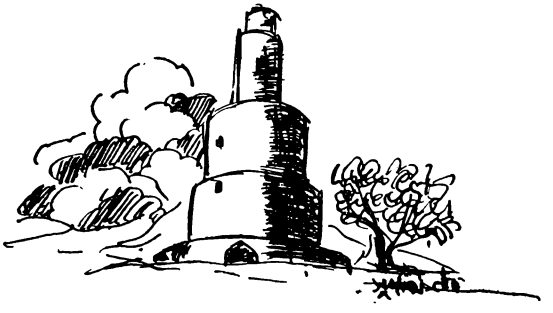

সুদক্ষিণা কুণ্ডু
গ্রাঃ সং ১০৮৫, বয়স ১৩

মজার লোক

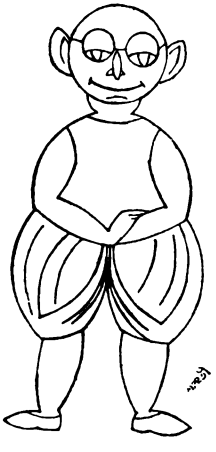

শাশ্বতী দত্ত—গ্রাঃ সং ৫৭—বয়স ১৫ বছর

খুকু ও বোন

সোনালী চৌধুরী—গ্রাঃ সং ১৭০৪, বয়স—১৪ বছর

# পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সৌরভ দে
স্ক্যান করেছেন - সৌরভ দে
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

## আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com